ISSN: 2455 0795

Khumulwng College Research Journal (KCRJ)

(A multidisciplinary,multilingual peer reviewed research journal published annually by Govt. Degree College,Khumulwng)

Vol : 4
Issue : 4
Year : 2021

Govt. Degree College,Khumulwng
Jirania,Tripura-799045, India
gdc_khumulwng@rediffmail.com
Phone:+919402137370

Advisors

1. Prof. Saroj Kr. Choudhuri
Professor of English

2. Smt. Dipanwita Dasgupta
Rtrd. Associate Professor of histoy

3. Dr. Dhananjoy Gan Choudhuri
Ex-Principal, NSM Udaipur

DISCLAIMER: Authors are solely responsible for factual accuracies and views/opinions in their respective articles/papers published in this journal. The publisher/editorial board is not responsible for any issues arising related to plagiarism, copy right, intellectual property or related matters published in this journal.
Khumulwng College Research Journal(KCRJ)
ISSN: 2455-0795 Volume: 4 Issue: 4 Published : September, 2021
Publisher: Editor in-chief for KCRJ,Govt. Degree College, Khumulwng
©Govt. Degree College, Khumulwng,Jirania, Tripura

Editorial Board

Editor in –Chief

Dr. Nityananda Das, Principal-in-Charge, Govt. Degree College,Khumulwng

Associate Editors

1. Dr. Arun Kumar Mukherjee, Assistant Professor, GDC, Khumulwng.
2. Sri. Daniel Debbarma, Assistant Professor, Dept. of Education, GDC, Khumulwng.
3. Sri. Prasenjit Debbarma, Assistant Professor, Dept. of Political Science, GDC, Khumulwng.
4. Sri. Bhupendra Debbarma, Assistant Professor, Dept of Philosophy, GDC, Khumulwng.
5. Sri. Pradip Debbarma, Assistant Professor, Dept. of Histoy, GDC, Khumulwng.
6. Sri. Subrata Debbarma, Assistant Professor, Dept. of IT, GDC, Khumulwng.
7. Sri. Manish Rudrapal, PGT, Dept. of Bengali, GDC, Khumulwng.

Editorial Members

1. Dr. Pranabjit Bardhan Roy, Assistant Prof. Dept. of EVS. GDC, Khumulwng.
2. Smt. Aparna Bhowmik, Assistant Prof, Dept. of Bengali, GDC, Khumulwng.
3. Smt. Shyamashree Sarkar, Assistant Prof., Dept of IT, GDC, Khumulwng.
4. Smt. Maharani Hrangkhawl, Assistant Prof., Dept. of Hindi, GDC, Khumulwng.
5. Smt. Mandira Deb, PGT, Dept. of Education, GDC, Khumulwng.
6. Smt. Tulika Bhattacharya, PGT, Dept. of History, GDC, Khumulwng.
7. Sri. Satyajit Roy, PGT, Dept. of History, GDC, Khumulwng.
8. Smt. Rupa Banik, PGT, Dept. of Philosophy, GDC, Khumulwng.
9. Smt. Tapati Bhattacharya, PGT, Dept. of Philosophy, GDC, Khumulwng.
10. Smt. Gouri Chakraborty, PGT, Dept. of Political Science, GDC, Khumulwng.
11. Smt. Krishna Majumder, PGT, Dept. of English, GDC, Khumulwng.

❖ Cover Design : Prabir Saha,
Pradipa Printing Press.

Contents

■ বিশেষ	–	মনীশ রুদ্রপাল	– 9
■ আশাপূর্ণা দেবীর কলমে শিশু ও কিশোর	–	ড: তৃষা চক্রবর্তী	– 11
■ *In a Strange Darkness*: An eco-critical reading of some Select poems of Assam and Tripura	–	Dr. Arun Kumar Mukherjee	– 18
■ Reflection of Nature in the literature of North-east: An eco-critical reading of the selected North-east Indian Poets	–	Kalyani Hazarika	– 27
Critiquing Pantheism: A Religious Dogma or a Literary Trope?	–	Krishna Majumdar	– 36
■ Invasive species: The biological form of environmental pollution	–	Mr. Koushik Debbarma	– 39
■ রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তায় গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের প্রসঙ্গ ও প্রচেষ্টা : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন	–	ড. অর্চনা দণ্ডপাঠ	– 42
■ বিজ্ঞানভাবনা ও বিদ্যাসাগর	–	দীপান্বিতা দাশগুপ্ত	– 51
■ ঊনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ	–	তপতী ভট্টাচার্য	– 64
■ রিপোর্টার	–	ডঃ মহুয়া আচার্য	– 67
■ The Refugee Rehabilitation Movement in Tripura	–	Dr. Nityananda Das	– 70
■ লোকনাট্যে লোকভাষা ঃ শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা'	–	ড. মৌসুমী পাল	– 78

Editorial

It gives me immense pleasure to write up the editorial for the 3rd issue of ***KCRJ***, ***Khumulwng College Research Journal*** ,2019-20 (Vol.III) – A peer–reviewed multidisciplinary National journal, the only of its kind among all the degree colleges run by the Department of Higher Education under the Government of Tripura.

Right from its journey, **KCRJ** has been performing a pioneer's role in the promotion of research activities among not only the faculty members of different colleges of the state, but also some noted academicians and mostly, the young scholars and researchers, who in spite of their lugubrious efforts in exploring the frontiers of knowledge, rarely get the desired exposure and critical acclaim they deserve for their ingenious efforts. This present volume covers a wide range of discourse on diverse topics right from some critical aspects in the works of Classical figures like Wordsworth, Tagore and Ashapurna Devi and social activists like Swami Vivekananda; to some ecocritical studies also concerning the literatures of North-east. The volume also showcases some entertaining articles on ecosystem, social problems and exquisite pieces of creative writings like Short story, Critiques, Socio-mythic studies etc.etc.; just to name a few; addressing different aspects of experience, be it on the level of factual, imaginative or ideational.

We sincerely hope that the present edition will elicit similar enthusiasm and support from the academic fraternity as it had received on earlier occasions.

Dr. Nityananda Das
Principal
GDC, Khumulwng

বিশেষ

মনীশ রুদ্রপাল
কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
সরকারি মহাবিদ্যালয়, খুমুলুঙ

একটা বিষয়কে "বিশেষ" করে তুলতে বা বিশেষাঙ্গকে বিশেষভাবে বিভূষিত করতে চিন্তার উদারতা, সচলপক্ষ ভাবনা, আত্তীকরণে সক্ষমতা আর চিত্তভূমির উর্বরতা নিতান্তই আবশ্যক। নইলে বিশেষ তার কৌলিন্য হারিয়ে সাদামাটা সাধারণের মাঝে মুখ গুঁজে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। চিত্তের সাথে যেমন বিত্ত, তেমনি বিত্তের সাথে ও চিত্তের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সাধিত হলেই বিশেষ বর বেশে কুঞ্জাসনে বসার যোগ্যতা লাভ করে। ফুল ফুটে উঠায় তার স্বাভাবিকত্ব কিন্তু রূপাতীত জৌলুসে প্রকাশিত হয়ে স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে সাধারণ চোখেও যখন চুম্বক দশা প্রাপ্ত হয়, তখন বিশেষে উন্নীত হয়। সহজ রূপের প্রকাশ পেরিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত রসে মথিত হয়ে অন্তরে উন্মীলিত হয়। আমরা মনুষ্য— দেহে; কিন্তু মনুষ্যত্ব? মনুষ্যত্ব একটা অনন্য সাধারণ গুণ; বিশেষ গুণ যা পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক আবহে গোপনে ফুলের মতো অন্তরে বিকশিত হয়; আর তার মিষ্টি সুবাসে মোহ মুগ্ধ, ধন্য ও অনুপ্রাণিত সান্নিধ্য জনেরা।স্ব-জাতের জাতের স্বাভাবিকতার উর্দ্ধে উঠে নিজেকে মেলে ধরার নাম বিশেষ। যেমন, নভোমণ্ডলে, অগণ্য তারার মাঝে সমগোত্রীয় হয়েও সর্বাধিক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

কেউ কেউ গাম্ভীর্য নামক কৃত্রিম ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করে মানুষের হৃদয়াসনে উপবিষ্ট হওয়ার সচেতন প্রয়াস মনোমধ্যে পোষণ করেন বিশেষ হয়ে উঠার বাসনায়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা কন্টকিত হয় বিদ্রুপ আর আড় চোখো অভ্যর্থনায়। কিন্তু চেতনার অগভীরতা হেতু মানুষের অন্তস্থ: রসায়ন অনুধাবন দূর অস্ত। অন্তর-পাঠ কেবল গভীর অনুভূতি প্রবণ, সহৃদয় মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গাম্ভীর্য আর হাসি— লেবুর জলে চিনি, নুনের মতো হলেই সেটা সুদৃশ্য এবং বিশেষ হওয়ার যোগ্য দাবিদার।

বিশেষ বিশেষণে সবিশেষ হয়ে মনুষ্য অন্তরে শান্ত ও আনন্দ রসের উৎসারণ ঘটায় যা শুধু অন্তরের আতিশয্যই প্রবর্ধিত করে না, দেহের জৈব গঠন প্রণালীকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে পজিটিভ হরমোনের (ইনডরফিনস্, মেলোটোনিন, এনসেফিলিয়নস্ ও ডোপামাইন ইত্যাদি) নি:সরণ ঘটিয়ে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবজগৎ, প্রকৃতি ও নভোমণ্ডল — সর্বত্রই বিশেষের বিশেষ হয়ে উঠায় বিশেষ কদর নইলে সে সাধারণের ভিড়ে হারিয়ে যেত। বিশেষ মূল্য— বান আবার মূল্য নিরপেক্ষ ও। মূল্য-বান যেমন, আজকাল প্রায় সব পাথরেরই অল্প বিস্তর মূল্য রয়েছে কিন্তু হীরা সর্বাধিক মূল্যে ও অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিতে সবিশেষ হয়ে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করলেও সর্বলোকের প্রিয় ও প্রশংসাধন্য। আবার মূল্য নিরপেক্ষ যেমন, অনিন্দ্য সুন্দর গোলাপ কানন আলো করে যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় তখন চোখে আর মনে তার একটি দীর্ঘকাল স্থায়ী অমলিন রসমণ্ডিত ছাপ রেখে যায়। দেহ ও মনের ক্ষেত্রে দুটোর মূল্যই অপরিসীম। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিষয় ভাবনাকে প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলতে শুধুমাত্র দুটো জিনিসের অবতারণা করা হয়েছে এখানে।

মহান ব্যক্তিরা তাঁদের কর্ম ও প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত প্রকাশে কোটিতে গুঁটিক হয়ে মানুষের অন্তর্লোকে স্থায়ী আসন লাভ করেন। অনুকরণীয় ও দৃষ্টান্তযোগ্য এই মানবিক চরিত্রগুলি বিরলতম দৈবগুণের অধিকারী। তারা বিশেষের উচ্চাসনে আরোহন করে সমগ্র জগতের শিক্ষক হয়ে রইলেন মর্ত্যকায়া মৃত্যুলোকে হারিয়ে যাওয়ার পরও।

প্রতিটা মানুষই বিশেষ হয়ে জন্মেও বিশেষত্বকে বহন করতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়। বিশেষ হয়ে জন্মে বলতে — স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যে বীর্য স্ত্রী জননেন্দ্রিয়তে প্রক্ষিপ্ত হয় তাতে চল্লিশ কোটি শুক্রাণু থাকে। এই

চল্লিশ কোটি দ্রুতবেগে ডিম্বানুর দিকে ধাবিত হতে হতে মাত্র তিনশত থেকে চারশত শুক্রাণু গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় আর বাকিদের অপমৃত্যু ঘটে পথেই। এই তিন-চারশত শুক্রাণুর মধ্যে সবগুলোকে পরাস্ত করে মহাশক্তিশালী একটি মাত্র শুক্রাণু ডিম্বানুর সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভ সঞ্চার করে। এইভাবে দীর্ঘ নি:সঙ্গ সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে বেড়ে উঠে মাতৃগর্ভে। কিন্তু ভূমিষ্ট হবার পর ?

প্রতিটা মানুষই বিশেষ হয়ে জন্মেও বিশেষত্বকে বহন করতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়। বিশেষ হয়ে জন্মে বলতে — স্ত্রী পুরুষের মিলনে যে বীর্য স্ত্রী জননেন্দ্রিয়তে প্রক্ষিপ্ত হয় তাতে চল্লিশ কোটি শুক্রানু থাকে। এই চল্লিশ কোটি দ্রুতবেগে ডিম্বাণুর দিকে ধাবিত হতে হতে মাত্র তিনশত থেকে চারশত শুক্রাণু গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় আর বাকিদের অপমৃত্যু ঘটে পথেই। এই তিন-চারশত শুক্রাণুর মধ্যে সবগুলোকে পরাস্ত করে মহাশক্তিশালী একটি মাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভ সঞ্চার করে। এইভাবে দীর্ঘ নি:সঙ্গ সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে বেড়ে উঠে মাতৃগর্ভে। কিন্তু ভূমিষ্ট হবার পর ?

তবে কিছু কিছু বিশেষের ও চুলচেরা বিশ্লেষণের পর বিচার হয় সময়ের আদালতে। যেমন ই = এম সি সকয়ার বিজ্ঞানে এক অভূতপূর্ব উদ্ভাবন। কিন্তু এর বিধ্বংসী আস্ফালনও তার যাবতীয় সুফল প্রদায়ী ভাবনা মুহূর্তেই করাল ভয়ের তপ্ত লাভায় প্রশমিত হয়। তবে সভ্যতার বিকাশে এর মূল্য অনস্বীকার্য হলেও তুল্য মূল্য বিচার প্রয়োজন সময়ের কষ্টি পাথরে। জীবন না আত্যন্তিক দু:সহ মৃত্যু। কারণ, অস্ত্র বিবেচকের ভিতরের ঘুমন্ত অসুরটাকে ও জাগিয়ে দেয়। বিশ্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ ধর্মে-কর্মে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে জীবকুলের মধ্যে বিশেষাসনে অভিষিক্ত হলেও হিংস্র শ্বাপদ সীমা অতিক্রম করতে পারেন নি অনেকেই। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর অর্থাৎ গৃহকোণে থেকে রাজ্য, রাষ্ট্র ও বিশ্ব - সর্বত্র রক্তচক্ষু আর অস্ত্র-সন্ত্রাস। এখানেও যুদ্ধ — বিশেষ হয়ে উঠার নগ্ন তাগিদে। ভয়ঙ্করের বুকের ভিতর ও বিশেষের বাস, এই পথে আলোকপাত না করে, বিচারের ভার পাঠক মণ্ডলীর বিবেচনার উপর ন্যস্ত হওয়াই আলোচকের বিধেয় বলে মনে হয়। তবে সময়ে কিছু কিছু বিশেষেরও পরিবর্তন, বিবর্তন আবশ্যক। কারণ সব বিশেষ চন্দ্র-সূর্যের মতো নয় আবার সব বিশেষ মানুষ ও মহামানবের মতো নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আস্ত একটা বর্ণ বাংলাদেশে সমগ্র হিন্দু সমাজে অবিসংবাদিত ভাবে 'বিশেষ' ছিল যা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করত, এমন কি জমিদারদেরও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করত। সেই ক্ষমতা বলেও সাধারণের অশিক্ষা ও ধর্ম ভীরুতাকে অস্ত্র করে শোষণ, পেষণ আর নির্যাতনের নীলাস্ত্রটাকে শানিয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হোত। সেই সময়ে বা যুগে যে ব্রাহ্মণ— পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, বিশেষ ছিল; এ যুগে এসে উল্লেখযোগ্য ভাটার টান পড়েছে তাতে। এটা ভাল হলো কিনা তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য - (এক) কালা পাহাড়ের কাল চোখে চোখ রাখলে (দুই) ঊনবিংশ শতকের সমাজের চালচিত্রে চোখ রাখলে। তবে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চেতন দণ্ডে আঘাতের পর আঘাত করেছে শিক্ষা; মুক্ত করেছে ভয়; বের করে এনেছে কুসংস্কারের সুকঠিন কপাট ভেঙে। আজ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আর পূজা-পার্বণে যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য আর ন্যূনতম দক্ষিণার দাক্ষিণ্যে, কায়ক্লেশে নিতান্ত অসহায়ভাবে বেঁচে বর্তে আছে ঐ যুগের ধারকেরা।

বিশেষ-ভাল একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। সেই সীমা লঙ্ঘন করলে বিশেষ— ভয়াল বিশেষে রূপান্তরিত হয়। সমুদ্র পাড়ে বসে অবিরাম ঢেউয়ের নয়নাভিরাম ক্রীড়া দেখতে কার না ভালো লাগে। যখন সরোষে সুনামী আছড়ে পড়ে ? এই সুবিশেষ ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায় অগণিত জীবন্ত প্রাণ আর অস্থাবর সম্পদ; আবার স্থাবরেরও নক্সা বদলে দিয়ে যায়। অগ্নি, বায়ু এসবের বেলায়ও এ কথা খাটে।

পরিশেষে, যাঁরা সৃজনশীল মানুষ, তাঁরা নিজেকে সম্পূর্ণ একা করে, মনের রসে জারিত হয়ে, গৃহকোণে বসে সৃষ্টি করে চলেছেন নিরন্তর। এই সৃষ্টি কতটা খ্যাতি বহন করে আনবে তার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় চিত্তে যে নির্মল রসের খেলা চলছে, সেই একান্ত আলাপন। এই ভাবেই একদিন তিনি হয়ে উঠেন অগণ্যের নগণ্য। মহান সব সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞান সাধক এই নগণ্য ধারার অনুবর্তী। এঁরা 'বিশেষ' 'বিশেষ' বিশেষণে সম্মানিত এবং অগণিত জনতার মনোমন্দিরে বিরাজিত।

আশাপূর্ণদেবীর কলমে শিশু ও কিশোর

ড: তৃষা চক্রবর্তী
সহকারি অধ্যাপক
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাশহর, ত্রিপুরা

শিশুসাহিত্য আশাপূর্ণাদেবীর সৃষ্টি প্রাচুর্যের অন্য এক দিক। এখানে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন অসীম ক্ষমতা নিয়ে। শিশুদের জন্য লিখেই তাঁর সাহিত্য জীবনে সূত্রপাত। শিশুরা ছিল তাঁর প্রাণতুল্য, তাই তাদের জন্য যা লিখেছেন তার সবটাই বাস্তবজীবন সমৃদ্ধ ও মানবিক গুণসম্পন্ন। এই লেখার উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন অভিজ্ঞতালব্ধ এলাকা থেকে। পরিচিত গণ্ডীর বিচরণভূমি কর্ষন করেই আশাপূর্ণা সোনার ফসল ফলিয়েছেন নিছক আজগুবি বা অবাস্তব কাহিনী তিনি লেখেননি। তিনি রোবট দেখেননি আইফেল টাওয়ার দেখেননি, দেখেননি স্ট্যাচু অব লিবার্টি — তাই এসব নিয়ে গল্পও লেখেননি। তবে এসব না দেখলেও — তিনি মানুষ দেখেছেন — দেখেছেন অজস্র, অগণিত মানুষের মিছিল, তাঁর গল্পে তাই ধরা দিয়েছে — কংসারি হাজারি, বদু, ছোট্ ঠাকুরদা, টেঁপি, ফুলি, বিন্দে, নটরাজ ওরফে নেটো কিংবা বন্ধুবৎসল সত্যেনের মতো চরিত্র। রসবোধ, দুষ্টুমি বুদ্ধিতে, বিপন্নতায় এরা উজ্জ্বল। প্রতিটি চরিত্রে রয়েছে ভিন্ন রকমের আকর্ষক বৈশিষ্ট্য। আশাপূর্ণা শিশুদের জন্য লিখতে গিয়ে আগে তাদের মনটাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং পরে তাদের মনের উপযোগী করেই গল্প লিখেছেন।

আশাপূর্ণা যেকালে বা যে পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন, সেখানে "শাসন" ভাবটাই প্রবল ছিল। ছোটদের প্রতি রক্ষণশীলতা ছিল অত্যন্ত বেশি। বারো তেরো বছরের ক্লাশ এইটের ছেলেরও একা একা রাস্তায় বেরোবার হুকুম ছিল না। কিছু কিনবার বা নিজের মতামত প্রকাশ করবার কথা তার হতো না। এই রক্ষণশীলতা এবং পরাধীন জীবনযাত্রাকে আশাপূর্ণা মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মন আশৈশব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে। আর প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন তীব্র, তীক্ষ্ণ লেখনী। মাত্র তেরো বছর বয়সে কবিতার মাধ্যমে সেই প্রতিবাদের সূচনা। কি নারী কি শিশু প্রত্যেকের অবরুদ্ধতার যন্ত্রণাকে তিনি যেন নিজের বুকে ধারণ করেছিলেন। তাই সেই যন্ত্রণায় কলম ডুবিয়ে লিখে গেছেন বহু উপন্যাস আর ছোট গল্প।

শিশুদের মন মুক্তি পেয়েছে তাঁর ছোট গল্পে। ছোটদের কথা আশাপূর্ণা ছোটদের মতো করেই ভেবেছেন। তাদেরও যে একটা নিজস্ব জগৎ এবং স্বাধীন সত্তা আছে সে কথা ভুলে যাননি। ছোটদের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন — তাদের চাওয়া পাওয়ার দিকগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন সাহিত্যের পাতায়। শিশুদের সম্বন্ধে আশাপূর্ণাদেবীর একটি নিজস্ব ধারণা বা চেতনা ছিল — যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর শিশু সাহিত্যে। শিশুদের নিয়ে এবং শিশুদের জন্য লেখা তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হলো —

'জ্যান্ত মাছে পোকা', 'বন্ধু বাৎসল্য', 'ক্ষুরের ধার', 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা', সব ভালো যার শেষ ভালো, 'স্বপ্নাদ্য কবচ', 'সুপ্ত স্মৃতি', 'চিঠির উত্তর', 'বজ্র আঁটুনি', 'খাতা', 'প্রথম বর্ষণ', 'কেষ্টর জীব' ইত্যাদি।

'জ্যান্ত মাছে পোকা' ছোটদের জন্য লেখা এক মজার গল্প। শুধু ছোটরাই নয়, সরসতার গুণে গল্পটি বড়দের কাছেও উপভোগ্য হবার যোগ্য। ননীগোপাল স্কুলের গর্ব। কারণ, ননীগোপাল কবি। স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠানে ননীগোপাল কবিতা লিখে দেয়। স্কুলে ম্যাগাজিন ননীগোপালের কবিতা ছাড়া অচল। সেই ননী হঠাৎ করে দেশের বাড়ির নায়েবের এক চিঠি পেয়ে বিরাট এক কবিতা লিখে ফেলল। সেই চিঠিতে নায়েব মশাই লিখেছেন —

"বোধহয় অবগত আছ, মহামহিম কর্ত্তা মহাশয় কাঁশীধামে গত হইয়াছেন"।[১]

কর্তামহাশয় অর্থাৎ ননীর দূরসম্পর্কের দাদু — যিনি ননীর একমাত্র আশ্রয়স্থল আর ননীও তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেই দাদামহাশয় কাশীধামে গত হয়েছেন শুনে ননী নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি। আসলে নায়ের মশাই লিখেছিলেন যে, দাদামহাশয় কাশী বিশ্বেশ্বর দর্শন করার জন্য কাশীধামে গেছেন। কিন্তু ননী তার কবিসুলভ কোমল অনুভূতি দিয়ে ধরেই নিয়েছে যে দাদামহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে। দাদামহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে ভেবে ননী, 'অকবি'র মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদেও ফেলে। তারপর শোক কিছুটা প্রশমিত হলে স্বভাবকবি ননী দাদামহাশয়ের প্রয়াণে 'শোকোচ্ছ্বাস' নাম দিয়ে এক বিরাট কবিতা লিখে ফেলে। সেই কবিতার পাঁচশো কপি ছাপানোও হয়ে যায়। চওড়া কালো বর্ডার টানা বেগুনী কালিতে ছাপা 'শোকোচ্ছ্বাস' সমস্ত স্কুলে বিতরণ করা হয়, 'ইনফ্যান্ট' ক্লাশও বাদ যায় না। ননীর দাদামহাশয় জমিদার ছিলেন, ননী তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেজন্য শ্রাদ্ধের আয়োজনও করা হলো বিশাল করে, গ্রামের মানুষ শহরের সুখাদ্য বিশেষ খেতে পায় না, তাই খাবারের আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেনি ননী —

'দ্বরিকের লোক যাবে মিষ্টি নিয়ে। কপি যাবে দুশো, মটর শুঁটি আধমণ— অসময়ের জিনিস পাড়াগাঁয়ের লোক চোখেও দেখে না এখন। ময়দা, চিনি মেওয়া পেশোয়ারী চাল থেকে ভিয়েনকর বামুন পর্যন্ত অনেক কিছু যাবার বন্দোবস্ত হয়ে আছে।"[২]

ননীও দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, স্কুল হস্টেলের ঘরেই হবিষ্য করে নিচ্ছে। এমন সময়ই ননীর দাদামহাশয়, নায়েবসহ সশরীরে এসে উপস্থিত হলেন ননীর কলকাতার স্কুল হস্টেলে। প্রথম ননী এবং তার বন্ধুরা ভূত বলেই ভেবেছিল, কিন্তু যখন দেখল যে, ভূত নয়, সত্যিকারের দাদামহাশয়ই এসেছেন তখন ননীগোপাল যারপরনাই রাগ করে। রাগত মাথায় সে বলেই ফেলে —

"তাই এলে এলে, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেই আসতে পারতো তো? এটা সুদ্ধু আমায় অপদস্থ করা — নয়।"[৩]

তার রাগের কারণ একটাই, দাদামহাশয় এর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে যে ভুমিভোজের আয়োজন করেছিল তা আর কার্যকরী হলো না। আবার নতুন করে সমস্ত বায়নাপত্র বাতিল করতে হবে, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল দাদামহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে, তাদেরকে আবার তাঁর জীবিত ফিরে আাসার সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। বিয়ের তারিখ পাল্টাতে শোনা যায় কিন্তু শ্রাদ্ধের তারিখ পাল্টাতে শোনা যায় না কখনো। অথচ ননীকে মৃত্যুর তারিখ পাল্টানোর এই কঠিন কাজটিই করতে হবে। তাই যে দাদামহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ননী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, তাঁরই জীবিত প্রত্যাবর্তনে ক্রোধে আগুন হয়ে ওঠে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটি এক অদম্য হাসির খোরাক জুগিয়ে যায়। কবি ননীগোপাল, তার স্তাবক বন্ধুটি, স্কুলের চাকর গোবিন্দ, নায়েব মশাই এবং ননীর দাদামশাই স্বয়ং প্রত্যেকেই গল্পের হাসির উৎস। আশাপূর্ণাদেবী পরিচিত পরিবেশ থেকে কাহিনী ও চরিত্র চয়ন করে এমন নিটোল গল্প লিখে গেছেন অজস্র। এই গল্পগুলো নির্মল হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে মানুষকে আনন্দ দান করেছে।

'বন্ধু বাৎসল্য' গল্পের সত্যেন ওরফে খোকন চরিত্রের মধ্যে লঘু হাস্যরসের মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। খোকন ভাল ছাত্র। ক্লাশ প্রমোশনে সবসময়ই ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হয়। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনে সে ফেল করে। তার অকৃতকার্যতায় বাড়ির সবাই, আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরাও অবাক হয়ে যান। কেউ এর কারণ আবিষ্কার করতে পারেন না। তাই তিরস্কারের ঝড় বয়ে যায়। বড়দা, মেজদা, সেজদা, ন'দা, বাবা দিদি এমনকি ছোটবোন খুকির কাছেও ষোল বছরের খোকন অপদস্ত হয়। তবু খোকন সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেয়। অবশ্য পরে আসল রহস্য জানা যায়। খোকন তার প্রাণের বন্ধু গণেশের জন্য ইচ্ছা করেই, ফেল করেছে। গণেশ পরীক্ষার আগেই বলেছিল যে, সে পাশ করবে না। পাশ না করলে কলেজেও যেতে পারবে না। অথচ খোকন বন্ধুর বিরহ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। বন্ধুর দুরবস্থার কথা ভেবেই সে স্থির থাকতে পারেনি। বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য, বন্ধুবাৎসল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সে নিজে সাদা খাতা দিয়ে পরীক্ষার হল

থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফলশ্রুতি হল ম্যাট্রিকুলেশনে ফেল। কিন্তু যে গণেশের জন্য খোকন এত বড় হঠকারিতা করেছে— সে কিন্তু যথারীতি পাশ করে যায়। গণেশকে সরলভাবে বিশ্বাস করে এত ভুল করে বসবে একথা খোকন ভাবতেই পারেনি। তাই বন্ধুবাৎসল্যের এই চরম অপমানে নিষ্ফল আক্রোশে মারমুখী হয়ে ওঠে খোকন। গণেশকে বলে যে, সে নিশ্চয়ই একবছর অপেক্ষা করবে খোকনের জন্য। কিন্তু গণেশ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে হো হো করে হেসে খোকনের মুখের সামনে দুটো বুড়ো আঙুল নাচিয়ে পালিয়ে যায়।

কিশোর মনস্তত্ত্বের এক অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে এই গল্পটির মধ্যে। বয়ঃসন্ধি লগ্নের কিশোর-কিশোরীদের মনের মধ্যে থাকে এক কল্পনার জগৎ। সেখানে বাবা-ভাইবোনদের থেকেও বেশি প্রাধান্য পায় বন্ধুরা। মানসিক বিকাশের সন্ধিক্ষণ কিশোর-কিশোরীর মনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এ গল্পের খোকনের মনের মধ্যে আছে আত্মত্যাগের বাসনা। আবার নিজের 'ষোল বছর' বয়স নিয়েও সে গর্বিত। তাই মেজদার তিরস্কারের জবাব দেবার প্রয়োজনই বোধ করে না সে। তার মনে হয়— "না হয় ম্যাট্রিক ফেল করেছে, তাই বলে কি ওর ষোল বছর বয়স হয়নি? সাঁতারু ক্লাবের মাস্টার, রামমোহন লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান কি ওকে, 'আপনি' বলে কথা কন না? এত গালাগাল কিসের বাপু?"[৪]

কিন্তু খোকন নিজেকে যতই বড় বলে ভাবুক না কেন, তার মনের মধ্যে রয়েছে শিশুর সারল্য। সে জন্যই তার কল্পনাপ্রবণ ও অনুভূতিশীল মন বন্ধুর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তাই ভাল ছাত্র হয়েও পরীক্ষায় ফেল করার মতো আবিমৃষ্যকারিতা সে করেছে। এটাকে সে আত্মত্যাগের উদাহরণ বলেই ভেবেছে। কিন্তু তার 'আত্মত্যাগ'র জন্য স্বভাবতই গঞ্জনা ছাড়া আর কিছু জোটেনি। তার এই সিদ্ধান্ত যে আত্মঘাতী ও অবাস্তব একথা বোঝার মতো অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি তার ছিল না। খোকনের আবেগপ্রবণ কিশোর মানসিকতার পরিচয়ই এ গল্পের মুখ্য উপজীব্য।

'ক্ষুরের ধার' গল্পের নটরাজ ওরফে নেটোর দুর্দশা যেমন হাস্যকর তেমনি চমকপ্রদ। পনের বছর বয়সেই নেটোর দাঁড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে, স্বাস্থ্যও তার অপেক্ষাকৃত ভাল। তাই 'ধাড়ী ছেলে', 'বুড়ো হাতি', 'হোৎকা মিন্‌সে' ইত্যাদি বিশেষণগুলোহ বাড়ির লোকেরা নেটোর ওপরই প্রয়োগ করে। তাছাড়া বাড়ির যত 'ওচাঁ' উনচুটে কাজ আছে সব কিছুর দায়িত্ব নেটোর। এত কিছু পরও নেটো রেহাই পায় না। তার সেজকাকা বটুকভৈরব সেন লেখক। কিন্তু তার হাতের লেখা প্রেসের লোকদের বোধগম্য হয় না। তাই সেই লেখা কপি করার দায়িত্ব পড়ে নেটোর ওপর। বাজার করা, খোকার বল কেনা, খুকুর ঔষধ, কাকিমাদের পশম কেনা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ নেহাৎ অসহ্য মনে হলেও নেটো করে ফেলে। কিন্তু সেজকাকার লেখার পাঠোদ্ধার করে কপি করা তার কাছে মৃত্যুর মতো ভয়ংকর। কারণ, একটা নেংটি ইঁদুরের পা কালিতে ডুবিয়ে খাতার ওপর ছেড়ে দিলে যা হয়, নেটোর সেজকাকার হাতের লেখাও তেমনি দুর্বোধ্য। নেটো সেই লেখার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য অনেক কিছুই কল্পনা করে, কিন্তু কোনটাই তার মন:পুত হয় না। তবু শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধি বার করে সে। রাত্রে ভাল মানুষের মত ড্রয়ার খুলে সেজকাকার নতুন লেখা 'ক্ষুরের ধার' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রেখে দিয়ে আসে। পরের দিন সেজকাকা ড্রয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই হৈ হৈ শুরু হয়ে যায়। 'পৈশাচিক চিৎকার করে হাত পা আছড়ে ঘরের মধ্যে ঝড় বইয়ে দিয়ে সশব্দে মেঝেতে পড়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকেন সেজকাকা। পায়ের ধাক্কায় চেয়ার উল্টে যায়, টেবিল কাৎ হয়ে পড়ে, দুটো চায়ের পেয়ালাও ভাঙ্গে। আবার পাথরের দোয়াতদানি পায়ে পড়ে পা কেটে রক্ত বেরোতে থাকে। সেই অবস্থা থেকে একটু ধাতস্থ হয়ে সেজকাকা কতরভাবে জানালেন তাকে সাপে কেটেছে। বাড়িতে যথারীতি কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে, সেজকাকা মৃত্যু অবধারিত ভেবে গোঙাচ্ছেন, মেজকাকা গেছেন ডাক্তার ডাকতে, সাপে কেটেছে বলে 'রোজা'র বাড়িতেও খবর পাঠানো হয়েছে। এতসব কাণ্ডকারখানার পর নেটো কাঁচুমাচু মুখে জানায় যে, আসলে সেজকাকার ড্রয়ারে সাপ ছিল না, ছিল নেংটি ইঁদুর। তারপর ড্রয়ার খুলে দেখা গেল যে, 'ক্ষুরের ধার'

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ইঁদুরে কুচি কুচি করে কেটে ফেলেছে। এই দৃশ্য দেখে নেটোর সেজকাকা বটুকভৈরব সেনের খুশি হওয়ার কথা নয়। তাই নেটো বা নটরাজ পালিয়ে চলে যায় পিসির বাড়িতে। আর যাই হোক না কেন, নটরাজ সেজকাকার পাণ্ডুলিপির মর্মোদ্ধার করার হাত থেকে অন্তত: বেঁচে যায়।

'ছোট্ ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' এক মজার গল্প। ছোট্ ঠাকুর্দা খুবই ভাল মানুষ। নাতিদের কাছে প্রিয় ছোট্ ঠাকুর্দা। তাঁর সঙ্গে দল বেঁধে সবাই সিনেমা দেখতে পারে, আইসক্রিম খেতে পারে। সরবৎ, চানাচুর, চীনেবাদাম এসবও বাদ যায় না। দাদু একা একা সিনেমা দেখতে পারেন না, কারণ হাজার হাজার লোকের মাঝখানে একা একা সিনেমা দেখলে তাঁর 'ভীর্মি' হওয়ার জোগাড় হয়। আবার নতুন যে সিনেমাগুলো আসে সেগুলোও না দেখে তিনি পারেন না। তাই সিনেমায় গেলে তাঁর সঙ্গে থাকে — নন্তু, ভোলা, মটর, মিচকে, হারাধন আর তাদের সঙ্গী সাথিরা। ছোট্ ঠাকুর্দার সিনেমা দেখার একটাই উদ্দেশ্য— 'সিনেমাওয়ালা'দের নিন্দে করা। দেশে এত অভাব তবু সিনেমার মতো 'রাবিশ' জিনিস তৈরি করে কত টাকা নষ্ট হচ্ছে — এসবের সমালোচনা করার জন্যই ঠার্কুদা সিনেমা দেখেন। ছোট্ ঠাকুর্দা এত আধুনিক হলেও নিজের ব্রাহ্মণ্যতেজ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই নাতিদের নিয়ে রেষ্টুরেন্টে ঢুকে 'ভেজিটেবল' চপ মনে করে 'মটন চপ' খেয়ে ছোট্ ঠাকুর্দা সাংঘাতিক রেগে যান। দোকানীকে অজস্র 'শাপ-শাপান্তর' দিয়েও তাঁর শান্তি হয়নি। বাড়ি এসে তিনি কাশী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কাশী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তবে জলগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাশী যাওয়া তাঁর হয়নি। কাশী যাওয়ার আগেই নাতিদের কৌশলে তাঁর প্রচণ্ড পেট খারাপ হয়ে যায়। তাই তিনি পূর্ববৎ বাড়িতেই থেকে যান।

ঠাকুরদা আর ঠাকুরমার সঙ্গে নাতি নাতনীদের সম্পর্ক কত মধুর আর সহজ হতে পারে তারই রসপূর্ণ রূপালেখ্য অঙ্কিত হয়েছে এই গল্পে। তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবারের একটি সুন্দর চিত্রও এ গল্পে ফুটে উঠেছে। বলা যায়, লেখিকার মুন্সীয়ানা গল্পটিকে করেছে সুখপাঠ্য।

মানুষের জীবনের কোন্ ঘটনা যে কখন স্মৃতির মণিকোঠায় জমা হয়ে থাকবে তা কেউ বলতে পারে না আর কবে কখন কিসের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সুপ্ত স্মৃতির জাগরণ ঘটবে তাও অনেক সময় মানুষের অজানাই থাকে। তাই স্মৃতির জাগরণে মানুষ স্বপ্নাতুর আর অতীতচারী হয়ে ওঠে। সেই স্মৃতি কখনো কখনো হয় সুখময়, মধুর কখনো বা বেদনা ভরা। 'সুপ্ত স্মৃতি' এমনই এক স্মৃতি বিধুর গল্প। খুবই সাধারণ বিষয়বস্তু হলেও গল্পের গভীরতা পাঠকের মনকে স্পর্শ করে যায়। কেননা, এমন স্মৃতি মেদুরতায় অল্পবিস্তর সকলেই ভারাক্রান্ত হন।

একখানি বেগুনী মলাটের চক্‌চকে 'এক্সারসাইজ বুক' এই গল্পের প্রাপ্ত বয়স্ক কথককে নিয়ে যায় বহু বছর আগের এক থার্ডক্লাশে পড়া ছেলের কাছে, যে ছেলেটিকে একখানি রুলটানা খাতা পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল বহুদিন। এক আনা পয়সা দিয়ে সেই খাতা কেনার পেছনে ছিল কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস। আলুকাবলি আর ঘুগনিদানার লোভ সামলে একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে এবং দুটো পয়সার জন্য মার কাছে মিথ্যা কথা বলে তাকে সেই খাতা কিনতে হয়েছিল। তারজন্য নিদারুণ অপরাধ বোধেও পীড়িত হয়েছিল থার্ড ক্লাশে পড়া বারো / তেরো বছরের ছেলেটি। খাতা কিনেও সে খাতাটি ব্যবহার করতে পারেনি বহুদিন। গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে শুধু মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে আর গন্ধ শুঁকে রেখে দিতে হয়েছিল। আরো অনেক পরে পিসেমশাই-এর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই নিয়ে কবিতার কপি করেছিল সেই কিশোর ছেলেটি। অবশ্য সে খাতা হারিয়ে গেছে একদিন। কিশোর ছেলেটি যুবক হয়েছে। ক্রমে জীবনের ব্যস্ততার স্রোতে হারিয়ে গেছে রুলটানা খাতার মধুর স্মৃতি। কিন্তু বহুদিন পর প্রৌঢ় বয়সে এসে নিজের ছেলের ফেলে দেওয়া একখানি চক্ চকে খাতা দেখে তাঁর প্রৌঢ় মনে জেগে ওঠে কিশোর বয়সের সেই রোমাঞ্চকর স্মৃতি কথা। তাঁর মনে পড়ে যায় একখানি বেগুনী মলাটের চক্‌চকে খাতা একদিন তাঁর মনের একটা দিক খুলে দিয়েছিল, তিনি নিষিদ্ধ বস্তুর মতো গোপনে উপভোগ করেছিলেন নিজস্ব একখানি সুন্দর খাতা পাওয়ার সুখ।

সেই নতুন খাতা তাঁর প্রাণে জাগিয়েছিল পুলক শিহরণ।

মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের মনে স্মৃতির রোমন্থন করে। মনের মধ্যে লুক্কায়িত স্মৃতি মানুষের মনে আলোড়ন তুলে মানুষকে উন্মনা করে দেয়। এই গল্পের পূর্ণ বয়স্ক মানুষটিও ছোটবেলার স্মৃতি খুঁজতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন, তাঁর মন ব্যগ্র হয়েছে অতীতচারিতায়। সে জন্যই গল্পের ভাবমাধুর্য কিশোর-যুবক-প্রৌঢ় সকলকেই মুগ্ধ করার মতো। মনের ভাবের একটুকরো সুন্দর অভিব্যক্তি যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে গল্পটির মধ্যে।

'চিঠির উত্তর' একটি মর্মস্পর্শী গল্প। গল্পটির গঠন ভঙ্গিমাও অনবদ্য। পুরো গল্পটি একটি চিঠির আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। একটি মা-হারা ছোট্ট শিশুর মনের সরলতা, তার অসহায়তা, মায়ের জন্য তার ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। পথ-দুর্ঘটনা কোন অভূতপূর্ব কিছু নয়, আর দুর্ঘটনায় পথচারীর প্রাণহানিও নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আশাপূর্ণা যে গল্পটি লিখেছেন তা পাঠকের চোখকে অশ্রুসজল করে তোলে আর মন হয়ে ওঠে বেদনায় ভারাক্রান্ত।

এই গল্পের ছোট্ট সতুর মা নেই, বাবাও চলে গেছেন 'সিমলে পাহাড়ে'— সতুকে ফেলে। সতু কাকা-কাকিমা আর অন্যান্যদের কাছেই থাকে। মা নেই বলে তাকে আদর করবার কেউ নেই। গুড় দিয়ে বাসি রুটি খেয়ে তার ইস্কুলে যেতে হয়। কাজের ত্রুটি হলে সবাই তিরস্কার করে। সতু বা সতীনাথকে সব মেনে নিতে হয়। কখনো কখনো তার কান্না পায় কিন্তু মা রাগ করবেন বলে সে কাঁদে না। জানে, তার মা স্বর্গে 'ঈশ্বর মহাশয়ের বাড়িতে' বেড়াতে গেছেন। মা আর ফিরে আসবেন না একথা সতু বিশ্বাসই করে না। তাই চিঠির মধ্যে মাকে আকুল মিনতি জানায় ফিরে আসার জন্য। চিঠিতে তার ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। মাকে সে মনের কথা বলে —

"একটা কথা লুকিয়ে লুকিয়ে বলি মা — রাত্তিরে একলা শুতে আমার বড্ড ভয় করে। মানিকদাকে বললাম ওদের কাছে শোব। শুতে দেয় না বলে — ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুই যা হাত পা ছুঁড়িস বাপস্'। আমি তোমার সেই খাটখানায় একলাটি শুই। একদিন কিন্তু বেজায় মজা হয়েছে মা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মনে নেই যে তুমি স্বর্গে গেছ, বালিশটাকে তুমি মনে করে আঁকড়ে ধরেছি.....তখন কিন্তু মা বিশেষ মজা লাগে নি।"[৫]

ছোট্ট সতু কাকিমার খোকাকে রাখে, দোকান থেকে জিনিস কিনে আনে। তবু কাকিমা তাকে লক্ষ্মীছাড়া বলে, কাকিমা তাকে মারেও। কাকিমার শক্ত শক্ত হাতের মার খেতে খুবই কষ্ট হয় সতুর। তবু সে সহ্য করে নেয়, কারণ তার মা নেই, বাবাও তাকে একা রেখে চলে গেছেন। চিঠির পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে সতুর মায়ের স্মৃতি, মায়ের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুলতা। সে তার কচি মনের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়েছে চিঠির মধ্যে। সতুকে বোঝার মতো, তাকে স্নেহমমতা দিয়ে ঘিরে রাখার মতো কেউ নেই। তবু সে মায়ের ফিরে আসার অপেক্ষায় থেকেছে আর তার ছোট্ট বুকের ভেতরটা তোলপাড় করেছে মায়ের কাছে যাবার জন্য। কিন্তু মায়ের কাছে যে চিঠি লিখেছিল সতু— তা ডাকবাক্সে ফেলার সুযোগ তার হয়নি, তার আগেই মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। চিঠি ব্যাগে ঢুকিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথেই ট্যাক্সির ধাক্কায় সতু মারা গেছে, অকালে ঝরে গেছে ফুলের মতো একটি প্রাণ। এমন কত প্রাণ প্রতিদিনের পথ দুর্ঘটনায় ঝরে যায়, তাদের কথা কেউ মনে রাখে না। আশাপূর্ণাদেবী কিন্তু অকাল মৃত সতুকে সাহিত্যের পাতায় অমরত্ব দান করেছেন।

আধুনিক সমাজের বাবা-মায়ের বা অভিভাবকদের চাহিদা আকাশছোঁয়া। একটি মাত্র ছেলে বা মেয়ে যেন মা-বাবার আকাঙ্খা পূরণের যন্ত্র মাত্র। তাদের আকাঙ্খার পেষণে পিষ্ট হয়ে এ যুগের শিশু হারিয়ে ফেলে তার মূল্যবান শৈশব। শিশুর মধ্যে জন্ম নেয় গভীরতর অসহায়তার বোধ। বাবা-মার প্রতিও এক বিরুদ্ধ মনোভাব তৈরি হয় শিশুর মনে। শুধু তাই নয় একালের শিশু অনেকাংশেই আত্মকেন্দ্রিক আর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। এরজন্য মূলত: দায়ী অভিভাবকবৃন্দ। আশাপূর্ণাদেবীর 'বজ্র আঁটুনি' গল্পটির মধ্যে এমনই এক শৈশব হারিয়ে যাওয়া শিশুর কথাই চিত্রিত হয়েছে। যে বয়সে ছোট্ট খোকাটির মাঠে গিয়ে খেলার বয়স, কাদামাটি দিয়ে কিছু বানানোর বা খেলাঘর সাজিয়ে বসে থাকার কথা— সে বয়সেই তাকে মুখস্থ করতে হয় প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগের কঠিন বানানগুলো। খোকার কিছু ভাল লাগে না অথচ মাস্টারমশাই আর বাবা-মার কঠোর শাসনে তাকে

বইয়ের সামনে বসতেই হয়। বই সামনে রেখে তার মন ডালা মেলে চলে যায় কোন্ সুদূরে। বার বার মনে পড়ে ঠামা-দাদুর কথা আর তাঁরা যে থাকেন সেই রাখালপুরের কথা। রাখালপুর খোকার স্বপ্নের দেশ। তাই সেখানকার সব কিছুই তার ভাল লাগে। সেখানে কত রকমের ফুল, কত নতুন নতুন পাখির ডাক।

"রাখালপুরের শব্দগুলোও সব যে নতুন — পাখির ডাকই যে কত রকম — কিচ্ কিচ্, টিটি, কু উউ খোকার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। ফুল তুলতে বাগানে গিয়ে ঝরা পাতার ওপর দিয়ে হাঁটতে মচ্‌মচ্ শব্দ, গরু দুইবার গাবগুব গাবগুব শব্দ, জাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙার ঘড় ঘড় শব্দ — সবই খোকার খু-ব ভাল লাগে।"[৬]

রাখালপুর খোকার এত প্রিয় জায়গা, তবু তার সেখানে গিয়ে থাকা হয় না। ঠামা, দাদু, পিসি তাকে কতো ভালবাসে। কিন্তু তাদের ভালবাসার আকর্ষণ কাটিয়ে খোকাকে চলে আসতে হয়েছে তাদের কলকাতার বাসার চার-দেয়ালের আবেষ্টনীতে — যেখানে 'নাইকো দয়া মায়া নাইকো খেলা'। এখানে আছে বাবা-মায়ের শাসন আর মাস্টারমশাই-এর রক্তচক্ষু। এসব খোকার ভালো লাগে না। পড়া মুখস্থর ফাঁকে ফাঁকে তার মন ভেসে যায় রাখালপুর। সেখানে তার দাদু 'পঞ্চ পিদ্দিম' জ্বালিয়ে গোপাল ঠাকুরের আরতি করেন, পিসি সাজি ভরে ফুল আনে আর ঠাকুমা পেয়ারাতলায় বসে আমসত্ত্ব দেন। সেই চরাচর ব্যাপী সুখের রাজত্বে যেতে পারে না বলেই খোকার মন বিদ্রোহী হয়, মা-বাবার প্রতি বিরূপতায় ভরে ওঠে তার শিশুমন। সে তাই সঙ্কল্প গ্রহণ করে—

"খোকা বড় হলে কখনো কথা শুনবে না। নিজে টিকিট কিনে ট্রেনে চড়ে চলে যাবে।.....বাবাওতো শুনেছি ঠামার ছেলে হন নাকি, তবে ঠামার কাছে দাদুর কাছে থাকেন না কেন? খোকাও মার কাছে বাবার কাছে থাকবে না।"[৭]

বাবা-মার তীব্র শাসন, তাদের উচ্চাশা, একটি মাত্র সন্তানকে সবজান্তা করে তোলার অক্লান্ত প্রয়াসে ছোট্ট খোকা ঠিকমতো বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। তার মনে হয় সে যেন হেঁটে চলেছে ভালবাসাহীন ধূসর মরুর ওপর দিয়ে। তার ধারণা হয়ে গেছে যে, তাকে কেউ ভালবাসে না। বাবা, মা, রামশরণ, মাস্টারমশাই সকলেই তাকে শাসনযন্ত্রের যাঁতাকলে ফেলে পিষে ফেলতে চায়। স্বাধীনভাবে তার একটু খেলার অধিকারও নেই, কিছু বলতে গেলেও কঠিন শাস্তি পেতে হয়। তাই রাত বেড়ে চলে, বাড়ি নিঝুম হয়ে যায়, তখনো কিন্তু নিরুপায় আর অসহায় ছোট্ট খোকা ক্লান্ত — করুণ সুরে একটানা পড়তেই থাকে —

"দু'য়ের পিঠে নয় ঊনতিরিশ— তিনে শূন্য তিরিশ"[৮]

শিশুর মন প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়, আর সে চায় অনাবিল ভালবাসা, অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে গিয়ে একটি শিশুকে কাঁধে তুলে নিতে হয় পড়ালেখার বিরাট বোঝা। এই বোঝা নিয়ে দৌড়োতে পারলেই শিশু পৌঁছাতে পারে বাবা-মায়ের ইপ্সিত প্রতিষ্ঠার সোপানে। সব শিশু কিন্তু এই চাপ সহ্য করতে পারে না। তাই তার মনের সুকুমার বোধগুলি নষ্ট হয়ে গিয়ে জন্ম নেয়, হতাশা আর বিদ্রোহ। বাবা-মা নিজেদের শৈশবের কথা ভুলে গিয়ে সন্তানকে নানাভাবে সফল করে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, সন্তানের মানসিকতার কথা চিন্তা করার জন্য তাঁদের অবকাশই থাকে না। 'বজ্র আঁটুনি' গল্পের খোকা তাই বিশ্বাসই করতে পারে না যে, তার রাশভারী বাবা কখনো ছোট ছিলেন, তাঁর শৈশব ছিল। বিস্মিত খোকা মনে মনে ভাবে —

"বাবার নাম নাকি তারু। মিষ্টার টি. এন. চৌধুরী কিনা ঠামার কাছে তারু হয়ে গেছেন। ঠামা বলেন বাবা আগে যখন ছোট ছিলেন নাকি রাখালপুরেই থাকতেন।"[৯]

খোকার বাবা কাঠের পিঁড়িতে বসে, থালায় করে ভাত খেয়ে ইস্কুলে যেতেন। উঠোনের কাঁঠাল গাছের তলায় তার বাবার খেলাঘর ছিল, সেখানে ছোট্ট ঢেঁকি ছিল, মাটি দিয়ে বানানো গরু ছিল — এসব ভাবলেও খোকার আশ্চর্য লাগে। কারণ, খোকার বাবার মানসিকতায় ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাই যে বাড়িতে থেকে তিনি বড় হয়েছেন, তাঁর জীবনের ভিত গড়ে তুলেছেন — নিজের সন্তানকে সেখানে পাঠাতে তাঁর তীব্র অনীহা। তাঁর মনে হয় দু'চার দিন সেখানে থেকেই খোকা পাকা বদমাস' হয়ে এসেছে। খেলাধুলো শিখে

এসেছে জংলি আর অসভ্যদের মতো। বাবা মায়ের এই পরিবর্তিত মানসিকতা এ যুগের সন্তানের মনের ওপর কী তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে পারে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে এ গল্পের মধ্যে।

'প্রথম বর্ষণ' গল্পে অঙ্কিত হয়েছে বয়ঃসন্ধিলগ্নে পা দেওয়া এক কিশোরের আবেগ বিহ্বলতার কথা। 'হায়ার সেকেণ্ডারী' পরীক্ষার্থী ষোল বছরের টিপু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, মা-বাবার কাছে তার অকারণ প্রশ্রয় নেই বরং শাসনের তাড়না রয়েছে যথেষ্ট। যেহেতু সে পরীক্ষার্থী, সেজন্য তাকে একটি নিরিবিলি ঘর দেওয়া হয়েছে — ঘরটা রান্নাঘর আর সিঁড়ির তলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাই দুদিকে চীনের প্রাচীরের মতো বাধা, শুধু গলির দিকে একটি মাত্র জানালা। ঘরে একটা পাখারও ব্যবস্থা নেই। এই ঘরকে টিপু নাম দিয়েছে 'বায়ুশূন্য টিনের কৌটো'। ঘরের ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য টিপু একদিন গিয়ে বসেছিল পার্কের বেঞ্চিতে। তখনই হঠাৎ করে এল কালবৈশাখীর ঝড়। সেই ঝড়ের পূর্বমুহূর্তে গাছগুলো যেন আঁকা ছবি হয়ে যায়, আর কোথা থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে গায়ে লাগে টিপুর। একটু পরেই আসে বড় বড় ফোঁটায় শীতল বৃষ্টি সঙ্গে মাটির সোঁদা গন্ধ। প্রকৃতির এই রূপবদল কিশোর টিপুর মনে জাগায় পুলক শিহরণ, মনের মধ্যে উথলে ওঠে ছন্দ। টিপুর মনে অপ্রতিরোধ্য আবেগ বেরিয়ে আসে কবিতা হয়ে। টিপু আশ্চর্য হয়ে যায়, আগের পড়া নয়, মুখস্থ করা নয়, একেবারে 'সদ্যোজাত' কবিতা। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টিপু উচ্চকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে। তার মনের মধ্যে আদি কবির মতো আবেগোচ্ছ্বাস জেগে ওঠে। উদাত্ত সুরে নিজের কবিতার আবৃত্তি শুনে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। ঝড় আর কবিতার আবেগ টিপুর মনের সমস্ত বিক্ষোভের মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বায়ুশূন্য ঘরখানাকেও তার অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়। কারণ, সেই ঘরের নির্জন কোণে বসেই টিপু রচনা করে ফেলে তার জীবনের প্রথম কবিতা। এমন কি যে দিদির সঙ্গে তার অহরহ ঝগড়া — তাকেই প্রথম দেখিয়ে ফেলে নিজের নতুন সৃষ্টি করা কবিতা। ষোল বছরের টিপুর মনের মাটিতে সেই প্রথম বৃষ্টির অনুভব, তাই আবেগের মনমাতানো সোঁদাগন্ধ তার তারুণ্যকে সৌরভে ভরে দেয়। সদ্য তরুণ টিপুর জীবনের প্রথম সৃষ্টির অভিজ্ঞতাকে আশাপূর্ণাদেবী অত্যন্ত সহজ সরল সাবলীলভাবে এই গল্পে তুলে ধরেছেন। এ গল্পের টিপু কেবলমাত্র একটি পরিবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আবদ্ধ একটি ষোল বছরের ছেলে মাত্র নয়, তার আবেদন সর্বজনীন। যে কিশোর বা তরুণ নিজের অন্তরের উত্তাল আবেগ নিজের মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারে না টিপু তাদেরই প্রতিনিধি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের কিশোর-কিশোরী আর শিশুদের কথাতেই পরিপূর্ণ আশাদেবীর শিশু সাহিত্য। কোন সুদূর কল্পলোকের কাহিনী আশাপূর্ণার শিশুসাহিত্যের উপজীব্য নয়। বাস্তব জগতের বাস্তব মানুষের কাহিনীকেই তিনি গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। আগেকার দিনে শিশুদের জন্য রূপকথার জগৎ ছিল, ছিল ঠাকুমার-দিদিমার কাছে অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার। রাজা-রাজড়া, দুয়োরাণী, সুয়োরাণী, পক্ষীরাজ ঘোড়া আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর রাজ্যে শিশুদের মন ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বর্তমান যুগের শিশুদের সামনে রয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক অজস্র মনোরঞ্জক উপকরণ, রয়েছে কল্পবিজ্ঞানের চমকদার কাহিনী আর সর্বোপরি এ যুগের শিশুরা প্রতিষ্ঠার তাগিদে ব্যস্ত। তাই এ যুগের শিশুদের মনের মতো করে সাহিত্য সৃষ্টি করা যথেষ্টই আয়াস সাধ্য কাজ। আশাপূর্ণাদেবী শিশুদের জন্য রূপকথা লেখেননি গোয়েন্দা গল্প বা ভূতের গল্পও বিশেষ লেখেননি। তাঁর কাহিনী গ্রন্থনের সর্বাংশ জুড়ে যারা আছে — তার নিজেরাই শিশু বা কিশোর। তাদের মানসিকতা, তাদের আনন্দ বেদনা নিয়েই আশাপূর্ণা শিশু সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। ছোটদের জন্য লিখতে বসে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার দায়িত্ব তিনি নেননি। উপদেশ দেওয়া তাঁর মনোধর্ম নয়। তাঁর নিজের জানা ও দেখার জগৎ সেটুকু, সেটুকুই তুলে ধরেছেন শিশু ও কিশোরদের জন্য। তিনি লিখেছেন জানাচেনা সংসারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা শিশু ও কিশোর মনের স্নেহসিক্ত আন্তরিকতায় ভরা গল্প। চাকচিক্যময় কোন উপকরণের প্রয়োজন হয়নি, তাঁর হাতের কাছে ধুলোমাটি যা পেয়েছেন, তা দিয়েই অসাধারণ নিপুণতায়, অনন্য প্রতিভা বলে অপরূপ সৃষ্টি গড়ে তুলেছেন।

In a Strange Darkness: An eco-critical reading of some Select poems of Assam and Tripura

Dr. Arun Kumar Mukherjee

Assistant Professor

Department of English

G.D.C Khumulwng

Tripura-799045

The permeation of ecology in the field of literature has been considerably great since Rachel Carson's *Silent Spring* (1962) and now a days, eco narratives are studied as forms of oral literature popular among indigenous communities in which narratives relating to nature and surroundings of a particular region, dealing both with its primeval purity of the past and subsequent changes in course of time, holds as a receptacle the history and development of the community living there and its habitat into its present look. The ecosphere that has entered the collective psyche of a particular community, becomes manifest in the literatures of India's North East.

A synoptic survey of poetry in the seven (or eight including that of Sikkim) sister states in India's North-east bears out how even a minor change in the familiar environment sparks off a writhing sensitivity in the poetic heart that always felt a perfect peace with the plenitude of nature such as the mystic hills and magic rivers flowing with their gorges and ravines through dense forests along mountain ranges, often punctuated by small habitations in hamlets characterised by, among other things, - the *jooms*, the mixed smell of traditional flowers and the fragrant rice in the *Nabanna*, the melodic spell of a mythic bird or a traditional stringed instrument that fills the hollow of the evening sky. However, eco-consciousness as a mark of poetic experience shows distinctive qualities as per the delicate nuances of thoughts and feelings bred by the changed milieus, however little, for poets of different states. The present article proposes to offer a bird's eye view of the works of some leading poetic figures of Assam and Tripura.

In the poetry from Assam, changes in ecosphere such as, pollution, urbanisation, global warming and deforestation elicit poetic concern as manifest in the works of Navakanta Baruah, Anupama Basumatary, Ram Gogoi, Harekrishna Deka, Hiren Bhattacharyya among others. Though the theme becomes more explicit in the

Assamese poems of poet Nabakanta such as "Tamrongi Akax" (Copper colored sky), "Futsai boronor prithibi" (Ash colored world) etc.etc., his poems originally written or translated in English also bear a streak of ecocriticism. For example, the poem *Palestine* bears under the garb of socio-mythic implications, an alarming consciousness of a total disaster drawing near us as a result of our violation of moral norms and the apprehension is conveyed through a deft use of natural metaphor:

We housed them in prisons
For they wanted a home,
We killed them for they wanted eternal life
Then bulldozed their prisons into fields of corn.
(Nabakanta:2009:13:1-4)

The sacrilegious acts are fated to face natural justice sooner or later as the person holds:

What's that hand sticking out from the earth?
Other hands will sprout from it —
And tickle us to death. (L.5-7)

This acute eco-sensibility can also be marked in the works of another poet Anupama Basumatary. For instance in the poem *Snail*, the speaker's vicarious pleasure at breaking the shell of snails to watch on the floor 'their certain strange rhythm/that hid the agony of their dying'(L.8-9), is counterbalanced by 'the heart-breaking agony' received by the shell of the speaker as she fails to negotiate the surge and resurge of the 'marauding waves' of the sea.

An acute poetic urge to return to the elemental essence of life in the terrestrial world can be traced in the poetry of Lutfa Hanum whose poem titled *Poem* amply expatiates this centripetal nature of consciousness operating in nature as per the poet's vision:

The fallen leaves want
A green passage
Back to the branches of trees.
(Hanum:2009:22:1-3)

However, this symbolic return to the original self caught in imaginative perception breeds a similar penchant in the speaker to retain her original self notwithstanding the fulfillment of the reciprocity of feelings and passions with her lover and here the poetic reflection is reminiscent in a way, of the lover's intention of retaining each a

hemisphere and yet at the same time constituting together, a separate world in Donne's love-lyric *The Good Morrow* – "Let us possess one world, each hath one, and is one' (L.14).

And me, melting in you
Seek a passage back to me
Through the green ,
Through water, stones
Words and tunes.
(Hanum:2009:23:16-20)

Interestingly, while the metaphysical poet rests on the union of souls, for the poet from North-east here, the passion of love and the urge for union too can't but get expressed in the vesture of eco-consciousness.

The poetry of Srimanta Bhattacharya often marks a pallid projection of nature in the fitness of a pathetic tone of the theme that veers around a sense of loss in the atmosphere. In the poem *Between Bomb Blasts* for example, one notices a stunning economy of expression in the poetic attempt to silhouette the silence permeating atmosphere preceding and following blasts (of terrorism or counter-terrorism?) as the proverbial stillness before storm:

The Sky is rigged with booby traps. Nobody mentions
Death by lightning. Natural occurrences are rare;
In life as much as in death. So long as the silence lasts
There is no cause for panic.
(Srimanta: 2009:49:11-14).

Another poem of this writer *A Lament for Their Eyes* is soaked in pity possibly for the dead youth ostracized at the cult of violence and much in the fashion of Owen's famous verse *Anthem for the Doomed Youth*, the poem distills a moving pathos of flowery youth consigned to doom.

The sky sometimes weeps
The eyes do not weep, they cannot
The eyes have become clogged with excess salt
They cannot wash themselves clean like the sky
The eyes do not have the luxury of tears….
(Srimanta:2009:47:8-12)

However, the treatment of nature as a means of self –projection is often found to receive a Freudian twist in a poem like *Moonlight* by another noted Assamese poet Harekrishna Deka for example, where 'the emerging moon' standing on 'the floor of the sky' seems to be emblematic of the poet's self ('is it a reflection of my manhood'?) and, as if under a faint spell of the *libido*, the speaker receives a sort of revelation:

The Golden field of crop glistens,
I realize that like all women
The earth becomes pregnant.
(Deka: 2009:96:11-13)

The opulence of beauty in the moonlit night evokes a sense of sexual fiesta which though luring, remains elusive to the adolescent psyche of the persona:

Do the abundant crops dancing in the waves of moonlight
Give an inkling of some illicit love affair? (L. 14-15)

The yearning for a happy past, the lost home which was just an extension of nature is also found in the works of later day poets like Nilim Kumar among others. The following extract from a poem titled *Thief* articulates under the metaphor of 'theft,' the pang of losing as if one's umbilical cords of existential bliss that can be felt only in harmony with nature:

My deserted homestead of the past
Is now devastated and of concrete.
Trees and shrubs of stone and brick
Breathes with leaves of glass panes.
(Nilim: 2009:155:1-5)

The ironic thrust at the quality of experiences as the bounty of modernism or progress is hauntingly exposed in the following lines:

I wish that he steals
From my dining table the iron apples
The bronze grapes, the fleshy chopper
And from the fridge the white cold laughs. (L.8-11)

On the contrary, time has stolen bigger issues from the speaker's life and the images of fruits in the quotation above spell out the trauma of losing the blissful, familiar eco-space that sustains and encourages life:

Where is it lost, where is it lost
That mysterious ancient being of mine? (L.6-7).

Taken overall, the poetry of Assam posits a space which so often disturbed by natural disasters and man-made ills though, yet retains its nuclear innocence with the flora and fauna constituting as it were, a mythic realism envisioned in traditional *Bihu* songs and *Bagurumba* dance which uphold in the collective consciousness, the sanctity of heritage.

On the other hand, the poetry in Tripura offers an interesting picture of adulation and retrospection in terms of poetic attitude to nature in the works of the tribal and non-tribal poets of the state respectively.

In Kokborok poetry, best represented by the formidable phalanx of indigenous poets of Tripura such as Nanda Kumar Debbarma, Sachlang and Sudhanya Tripura, Shefali and Dipali Debbarma, Manishankar Mura Singh among others, the poetic approach to nature and environment is chiefly that of an absolute awe, at times tinged with some worries for wrongs done to her, but rarely showing any tendency to trace any ruthless element in the ecosphere. In a word, the element of eco-anxiety in Tripuri poets gets ultimately smothered by a visceral love for and an unquestioned dependence on nature. Apart from Kokborok poets, some other leading poets of the land such as Bhaskar Roy Barman (1950-), Niranjan Chakma (1951-), Kalyanbrata Chakraborti (1940-), Krittibas Chakraborty, Pijush Routh and Gombhini Sorokkhaibam (1971-) also have vociferously dealt with the themes of indigenous myth, legend and the ecology of their land.

In his poem entitled *Tripura*, poet Krittibas Chakraborty (in the book *Anthology of Contemporary Poetry from the Northeast* .P.246-48) has nicely presented in a chiseled form, the bucolic set up of the ecology of the land that dates back to the early settlement of different tribes across the fields and hills:

One day they left beyond the dawn towards the woods
The green corn of *jhum* and
Terrain flowers greeted them
They started living in the silent hills
Across the cucumber and *futi* fields.
(Chakraborty: 2003:24)

Again, the mute history of generations of the land — of their struggle, growth and challenge alongside the deterring ills of custom affecting the weaker sections of the society – all this is ably manifest in the ecology of the place. The following lines taken from a poem by Gombhini Sorokkhaibam are rich in eco-mysticism as well as eco-feminism:

A tree's also just the same-
Will take birth, grow, spring leaves, spread branches will
bear flowers, will hang fruits….
But, it doesn't have the power to say anything.
So I, where no love is bred in hearts,
am a frustrated woman of a society's brutal stage.
(Sorokkhaibam :2003: 262)

In the poetry of Kalyanbrata Chakraborti, one comes across a disquieting conjunction of pity and poetry. In poems like *Before a Trip to Sindhukumar* and *Manirung Reang*, Chakraborti makes a naked exposure of terrorism that is camouflaged by a cultured interpretation prevalent in the civic and academic parlance of the day. Another notable poem *In a Strange Darkness* articulates the trauma of losing one's original, familiar space as a by-product of cash-nexus that runs paramount under the façade of development:

" … it is simply propaganda that the imperialists have
Left our country for good.
Do the commoners want to realize anything beyond
Moneymaking?" (Kalyanbrata:2009:85:9-12)

The ennui and boredom induced by urbanization in the daily run of life also receives a telling evocation in the works of some other Bengali poets such as Aparajita Roy, Amulya Sarkar, Aloke Dasgupta et.al. Notably, the change in the familiar landscape in the works of the poets mentioned is often interfused with the change in the mindscape bred by the trauma of partition among other things. The following extract from the poem *Gone are lamp-lit Nights* conjures up the pallid cover of drudgery spread over the familiar evening and a resultant hazy feeling of nostalgia coupled with a vague fear of an uncertain future and against for the unwelcome changes in the familiar landscape:

Gone are the lamp-lit eves for long
Only the stifling load-shedding reigns
I grope for the door in vain,
To lock-out an old prisoner of darkness.
(Roy: 2005:31:1-4, *Translation mine*)

……

……..
Who would turn again the pages read out!
When some new pages wait to be written?
……..
Whom does the arrow aim at
Declaring war
In words written in fire on the wall,
Shall it set all lapses right?
(L.1-4, 7-8,10-13.*Translation mine*)

The poem *My Boat yearns to be Ashore* by Amulya Sarkar unravels a poignant account of post–partition violence which has turned the poet's familiar space in the border state, into a cemetery of hopes and dreams. The following extract shows how the epiphany of a 'sweet' homeland turns into a nightmare amidst the heart-wrenching cries of the widows, raped women and parents who have lost their wards in the altar of violence and civil war.

My woeful night throbs
Cribbed with enemy tents around
While I cover my body with cactus
Pall my child's corpse with moonlight
Some say it's the spring time of the year
Yet I am caught in midstream all along.
In my yard, now unknown serpents hiss,
The woods murmur the moaning of the raped,
……
The water of Gomati turns red
With a new spurt of bloodshed
Who is it that covers the *harmadi* cry
With chanting of *Chandipatha*!
Is this the land we dreamt all along,
To be a place my dear, for a sweet home?
(Sarkar:2005:36:1-8, 10-13, *Translation mine)*

A stifling awareness of insurgency and violence is further noticed in a poem by Shankar Basu named *Smell of Powder in the wind* where the lamp-lit sky of festive nights in the recent past is found to be covered with the pall of insidious nights that get occasionally split with the flash of guns with the wind carrying ash and the smell of powder. As the poet puts it:

The bestial glare and ecstasy of the night
Breaks the silence of the dozing town
The song of life halts at every beat
Light and blood join hands…..
Will they stop the flow of life?
Won't men again embrace each other
With the protective wrist-band on festive nights?
(Basu:2005:339:6-12.*Translation mine*)

The shocking change in the eco-space of the poverty-ridden indigenous people wrought by bloodshed and death associated with terrorism and/or its countermeasures gets a haunting expression in the poetry of Aloke Dasgupta. The following extract from a poem *Under a Stormy sky* nicely recaptures the unhappy inroads of urbanity and corruption in the poverty-ridden plight of the subaltern people and strikingly, nature as if sympathizes with the persona that deplores the loss of sanctity in a life that practically degenerates into a frantic bid for survival even to the exclusion of morality :

The metal sound of bullets often
tears apart the pitch dark of night!
Following a zigzag road, Padmamoni
reaches the syphilitic bed of a recluse pensioner
The sylvan breeze breathes the aroma of little Khumpui
and the fumes of gun-mouth.
A fresh oxygen worth 15 rupees
Undresses Padma of her *Pachra* and her shame!
A promise broken, champs the cabbage soul…
fire in the Joom burns the mythic Nuyai…
So grave a sin was in store for all! So grave a sin!
Feeling terribly alone under such a stormy vault, terribly alone!
(Dasgupta:2005:47: 4-11, *Translation mine*)

Thus, often it is the ingredients of a sordid reality, the pathos of poverty, compulsion and perversion that set the poetic fancy on fire to have produced such lines as the above.

To conclude, one simply wonders to see how these poets of India's North-east detect in the pretext of chaotic experiences, the text for creative expression and often manage either to diffuse on the familiar objects the transcendent kind of a 'light

that never was on sea or land' or to rehearse the kinds of consciousness that spring perennial in the human heart.

Works Cited

Carson, Rachael. *Silent Spring*. Massachusetts: Houghton & Miffin, 1962.Print

Das Gopalmani, Ed. *Dalit Sahitya: An Anthology of Poems* 2004. Agartala: Bharatiya Dalit Sahitya Akademi, 2005.Print

Donne, John. "The Good Morrow": *Grierson, Herbert J. C. (ed.). The Poems of John Donne. London: Oxford University Press, 1912*. Print

Ngangom, Robin S et.al Ed. *Dancing Earth: An Anthology of Poetry From North- East India*. Gurgaon: Penguin Books India, 2009.Print

……. ,, *Anthology of Contemporary Poetry from the Northeast*. Shillong: NEHU, 2003. Print

Reflection of Nature in the literature of North-east: An eco-critical reading of the selected North-east Indian Poets

Kalyani Hazarika
Assistant Professor, Department of English
Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya,
Nagaon, Assam.

Abstract- Poetry of North East India is always marked by a unique presence of nature whether in the form of a simple backdrop scenery or sometimes often as spirits and souls, playing an active role in artistic creation. One of the reasons for this indulgence could be perhaps the close proximity that the people share with nature. Before the advent of Christianity, Hinduism and other religions, animism and nature worship formed an integral part of the lives of NE people which led to the poets of the region becoming more aware of the immediate ecological surrounding. The common bond of poetic sensibility is predominated by love for the land, nature, myths, narratives and tribal folklore. The present paper thus uses Eco-criticism as a literary tool to delve into such and several other aspects of man-environment relationships in the writings of two poets from these regions, namely Temsula Ao and Kynpham Sing Nongkynrih. Besides being a celebration of the region's ecological glory in its myriad forms, their poetry also reflects their vehement reactions against humans' ruthless acts of ravaging the environment. By writing and raising concerns about the endangered environment, these poets endeavour to create an environmentally sensitive consciousness. This paper thus attempts to read these poets from an eco-critical perspective and explore how literature can be instrumental in retrieving nature from an imminent crisis.

Key words- Nature, Eco-criticism, Environment, Myth, Folk

INTRODUCTION

The term 'eco criticism' was first coined by writer William Rueckert in his essay *Literature and Ecology: An experiment in Ecocriticism* in 1978. In this book, he defined eco-criticism as 'the application of ecology and ecological concepts to the study of literature.' The writings from India's Northeast abound with ecological

concerns and are replete with impressions of nature such as the rivers, mountains, forests, wildlife, etc. and the myriads of ways they are interconnected with the lives and cultures of the people inhabiting these regions. They are the lyrical reflections on the inextricable relationship that the people of these regions have been sharing with the natural environment for ages. Consequently, "myth, landscape and nature, the particular predicament of people here and tribal folklore provide the core subject matter" (Daruwalla 2004). The tribes inhabiting these regions long ago realized the important role nature played in nurturing and sustaining their generations and so over the ages came to learn and practice a way of life in harmony with the natural environment. They "practice an animistic faith that is woven around forest ecology and co-existence with the natural world" (Dai, 2006). Their rituals, beliefs, social values, festivals, songs, dances and various transactions of life that comprise the tribal cultures are entrenched in the lap of nature. Quoting N. Chandra and Nigamananda Das from *Ecology Myth and Mystery: Contemporary Poetry in English from Northeast India*:

Indian English poetry from Northeastern part of India is rich in enshrining various aspects of the ecology, of the region. It has been a fashion with the poets of the region to celebrate the ecological glory of the region and their ecological awareness. The ruthless act of deforestation and oppression upon the Mother Nature in various ways by destroying the serenity of the nature, obliterating the natural environment, killing rare birds and animals and distorting the landscape and biodiversity, have been sharply reacted upon by these poets. (Chandra and Das 2007, 35)

However, the maddening race for modernization, industrialization and urbanization in the present times has taken its toll on the natural world and these regions are no exception. Humans' ever-increasing hunger for control and excessive exploitation of the natural resources for their selfish interests is adversely altering the harmonious relationship they once shared with nature. The poets hailing from these regions are very mindful of the deteriorating picture of their environments. They have employed their poetry as a medium to lament the damages done to their vulnerable ecosystems and express their apprehensions about the impending apocalypse. The present paper uses Eco-criticism as a literary tool to delve into such and several other aspects of human-environment relationships in the writings of two poets from these regions, namely Temsula Ao and Kynpham Sing Nongkynrih.

DISCUSSION

Temsula Ao

A prominent literary voice from Nagaland, Temsula Ao has to her credit many designations such as a poet, short story writer and ethnographer. Hailing from a

society that is deeply rooted in the tribal tradition and herself being a tribal, her work is informed by a profound regard for her rich cultural inheritance and carries strong impressions of the folklore comprising the myths, legends, fables, rituals and beliefs that are an integral part of the Ao-Naga culture. Several of her poems depict the strong bonding that these societies have with nature in the form of their beliefs, traditions, festivals and rituals. Temsula's poetry is marked by an insightful ecological sensibility which makes it relevant for an eco-critical reading and analysis. Her poetry reflects her earnest endeavour to return to her roots, and reclaim a lost identity that is inextricably linked with the hills and their ways of life. Some of the salient features of Northeastern tribal poetry present in Temsula Ao's collection of poem *Songs From the Other Life,* have been briefly discussed below, with examples from selected poems of the collection.

The Naga people became displaced as they were separated from their ancestral beliefs by the onslaught of Christianity. The British administrators had compelled the natives to change in accordance with their idea of progress and development with no concern for what such actions resulted in the minds of the natives. Without their cultural signifiers, the natives eventually lost themselves and were caught in confusion. Temsula writes,

Stripped of all our basic certainties
We strayed from our old ways
And let our soul-mountain recede
Into a tiny ant-hill.. (Ao:2011 pg 30-34)

Temsula has often written about her concern for the destruction of the lush forest and mountains. The symbol of mountain recurs in her poems and becomes an allegorical rendering of the glory of Ao people. The destruction caused to the mountains thus, led to the destruction of this glory. From an ecological point of view, disturbing the balance of nature by harming the hills and the mountains will definitely be fatal for the people residing in the area. Temsula's concern can be seen in the lines:

Alas for the forest
which now lies silent
stunned and stumped
with the evidence
of her rape
as on her breast
the elephants trample
the lorries rumble

loaded with her treasures
bound for the mills at the foothill (21-25)

Nature has always been associated with feminine gender by writers and philosophers of all time. Nature plays the ultimate figure of a mother, 'mother nature', who is a provider, protector and giver of life. The figure of 'mother-nature' immediately gives nature the task of sustaining and providing for human race. Nature's products are deemed free and available and something that is taken for granted by man.Feminists, have seen this similar exploits that nature and women suffer in a patriarchal society. Vandana Shiva and Maria Miles, imminent eco-feminists, say,

> We see the devastation of the earth and her beings by the corporate warriors, as feminist concerns. It is the same masculinist mentality which would deny us our right to our own bodies and our own sexuality, and which depends on multiple systems of dominance and state power to have its way.(34)

In a blind race for urbanization, human beings are gradually losing touch with and becoming forgetful of their responsibilities towards the environment, thus calling their own disaster. "Lament for an Earth" (Ao 2013, 42-44) as the title suggests reflects the poet's heartfelt anguish and concern for the miserable state of our planet and its natural environments. In this requiem for Mother Nature, the poet paints a plaintive picture of the disastrous effects of human civilization on the natural environments. Her use of the phrase "once upon an earth" in alternate verses has a fairy-tale like effect that she uses to evoke an immaculate and unspoiled image of nature prior to human intervention. However, phrases such as "Alas for the forest", "Alas for the river" etc that appear in subsequent verses, heighten the sense of contrast and create a sense of despondence while they describe the earth as it is now, battered and spoiled due to excessive exploitation of its resources by humans.

Another interesting feature of the poem is the use of the epithet "two-legged animal" to refer to humans. It aptly depicts a race which despite priding itself to be at the top of the hierarchies of all life forms, has stooped so low in its manners and actions that it is hell-bent upon destroying its very abode and that of the fellow species. The poet wishes to distance herself from an insensitive and selfish breed that has come to signify humanity and feels ashamed of belonging to it. It is also symbolic of the extreme depravity and cupidity that has today come to define the human nature.

It is muddy now
With the leaving
Of the two-legged animal
Who bleached her banks
And bombed her depths (45-50)

Temsula Ao has compared the body of a woman and its violation with the landscape and its devastation. The strong imagery of rape of forests culminates in a barrenness of the womb when she says,

Cry for the river
Muddy,misshapen
Grotesque
Choking with the remains
of her sister
the forest
No life stirs in her belly now
the bomb
and the bleaching powder
have left her with no tomorrow. (53-62)

Thus, the agents of the patriarchal society, the 'bomb' and 'bleaching powder', have cleansed and left the river and the forest barren. Eco-feminists have talked about how a man in a patriarchal society believes in domination over nature and women. Nayar observes in this context: "Ecofeminists argue that patriarchal society's values and beliefs have resulted in the oppression of both women and nature…" (Nayar2013:249).

The correspondence between woman and nature is also obliquely hinted at by Ao in the poem, "Requiem?" in which she writes:

Who will mourn?
Who will mourn this blackened mass?
This charred carcass
Of a recent blushing bride
Roasted on the pyre
Of avarice (1-6)

"Blessing" is another poem of Ao which is also critical of the notions of progress and development, and, in a way, of entire human civilization. Ao seems to be so unhappy with the norms of civilization that she writes:

Blessed are the unborn
For they cannot mourn
The loss Of what they
Never had (26-30)

Temsula's poems thus, constantly remind that the rapid ecological disturbances in NE region as deforestation and excessive use of natural resources are on the rise

vis-a-vis oppression of woman in a patriarchal society. By animating nature and lending it a discourse, she endeavours to break the silence of nature and empower it so as to safeguard its interests against the hegemony of an overbearing humanity whose intellectual capacity falls short of comprehending the 'silence of nature'.

Kynpham Sing Nongkynrih

Kynpham Sing Nongkynrih is a bilingual poet, fiction writer and playwright from Shillong, Meghalaya who writes both in Khasi (name of the indigenous tribe of Meghalaya as well as language spoken by them) and English. His poetry responds to the exigencies of his place and time and is replete with a wide range of concerns from political to environmental. His work is marked by an innovative employment of nature symbolism, cultural and literary references and carries the essence of the Khasi culture and folklore.

His poetry bears testimony to the adverse changes wrought by a rapid rise in urbanization and industrialization in the past few decades on the sensitive ecosystems of this region which makes it significant from an eco-critical perspective. The poem "An Evening by the Source of the Umkhrah River" (Nongkynrih 2011, 17) begins with an idyllic description of the Umkhrah as it flows "winding through the hills" with its "limpid water" and "bed of white sand" that has for visitors "occasional fisherman/ washing the clean earth from their sturdy feet", "country maiden, blushing and giggling/ on smooth, swarthy water-worn stones" and "gambolling children" whose euphonious cries are carried by the wind as it "ruffles the deep grass" playing "a tune with the head swaying pines." However, the poem ends abruptly in an anticlimax with the poet contrasting the countryside utopia with the urban sordidness.

Nobody cares that this limpid water,
the bashful maiden, the tuneful pines
are rolling down to the city
where life itself wallows in the filth. (13-16)

The last line raises concerns about the deteriorating state of the river. Wah Umkhrah and Wah Umshyrpi are the two main rivers that flow through Shillong eventually draining their waters into the Umiam Lake, which draws great significance from being the first hydel power project of Northeast India. The two rivers, Umkhrah and Umshyrpi have for ages been a means of sustenance for the people of Shillong and neighbouring areas and are solely responsible for providing electricity to the entire city. The rivers have been a source of identity for Shillong whose many localities are named after them. Besides, Wah Umkhrah has mythological significance as well. According to the beliefs of the Khasi tribe, the river is one of the nine streams of mythic origin that sprang from Shillong Peak, the chief deity of the Khasi tribe.

In the poem titled "Hiraeth" (Nongkynrih 2011, 29-30) which is a Welsh word loosely meaning a form of longing, the poet expresses his nostalgia for the good old days of his childhood when life was a lot simpler, quieter, and more peaceful. He craves for the bygone days when lives were in harmony with nature and simple joys like waking up to the rooster call, sounds of different birds, the tenderness of his mother and living in a close-knit community where everyone was friendly and warm made his life blissful. He expresses his longing by recalling the sounds, sights and songs of yesteryears, the memories of which are deeply embedded in his consciousness.

Out of that restlessness the past rises from dimly
remembered songs and I watch my ghostly ancestors
hasten from their dark pallets at the rooster's
first reveille; warming up for their fields,
boiling rice, packing their midday meal in leaves. (12-16)

The poem reflects the dilemma of modern societies which in a race for urbanization and globalization are gradually losing their touch with the old familiar natural ways of the past. Consequently, the tribal culture is gradually losing its moorings and giving way to the modern ways. The poet's mention of the various sounds of nature in the poem also points to the rich musical tradition that the Khasis follow. Music forms an integral part of their life as "every festival and ceremony from birth to death is enriched with music and dance. One can hear natural sounds enmeshed in the songs - the hum of bees, bird" calls, the call of a wild animal, the gurgling of a stream" ("Festivals and Ceremonies of the Khasis"). The poem contrasts the past marked by mellifluous sounds of nature with the present characterized by chaos and cacophony emanating from the concrete jungles that have replaced the natural environments due to excessive migrations and rampant urbanization of the regions.

No more do I hear the morning sounds of home:
birds warbling, cicadas whining, crows cawing,
chickens yapping about the yard and my uncle
readying for the cement factory.
……..
Strange sounds are crowding this town
Like the rooster, I too, seem
To have become obsolete. (4-7, 28-30)

The poem "Rain Song 2000" (Nongkynrih 2011, 38-40) draws attention towards the adverse climate changes occurring across the globe as a result of the ecological imbalance which are nature's warning signs of an impending apocalypse. The introduction of the poem may remind one of the opening lines of the General Prologue from the *Canterbury Tales*: "When in April the sweet showers fall/that pierce March's drought to the root and all", (Chaucer "From the Canterbury Tales: General Prologue"), while the only difference being that here, "The April sky has taken us all by surprise/spouting incessantly for the last many days" (1-2). The poem evokes a sense of urgency about the imminent ecological crisis that threatens our planet with dire consequences if not checked in time. The employment of anthropomorphism in the following lines creates a counter discourse that questions the exploitative regime of human thought by breaking the silence of nature and lending it a voice as evident in the following lines:

so why is the sky weeping
a river of unseasonable tears?
Why is the wind shrieking night and day
and pines beating their chests in pain? (21-24)

In "Kynshi" (Nongkynrih 2011, 43-45), the poet expresses his heartfelt concern and anxiety about the deteriorating state of environment of the river *Kynshi* and its surroundings. The "sovereign river" which has bred "the truest Khasi braves" lies in a deplorable state today as a result of the human kind's excessive greed for natural resources. The poet laments the loss of greenery and defacing of the serene hills that has been brought about as a result of indiscriminate developmental activities. The following lines reflect his anguish at the spoiling of pristine environments:

Inevitably, however, here too,
time has left its ugly wounds
Pines like filth are lifted
from woodlands in truckloads.
Hills lose their summer green,
blasted into rocks,
into pebble and sand
and the sand is not spared. (36-43)

CONCLUSION

Thus, nature forms an integral part of the poetry produced in NE states. The attitude of the poets towards nature and their treatment of it in poems are different

from one region to another. Sometimes, nature becomes the spirit of people and sometimes, it becomes the identity of a community and yet some have talked about nature through the current day's violent incidents faced by NE people. The common ground of these poets is their awareness of the changes in the immediate ecological surrounding *vis-a-vis* the lifestyle of the people. Though Raymond Williams has talked about the binary opposites of culture and nature, the effect of one on the other can be seen in the poems of NE and an eco-critical outlook helps in understanding this intricate relationship of nature and culture that can be found in almost all the poems of NE.

The Ecocritical analysis of the two poets chosen for study, namely, Temsula Ao and Kynpham Sing Nongkynrih, reveals a poetic consciousness informed by a deep love and concern for their indigenous cultures, traditions and fragile environments. Theirs is a poetic voice that employs the power of lyric to raise environmental awareness amongst the peoples of these regions and urges them to apprehend and check the demonic forces of urbanization that severely threaten our existence on this planet. These writings serve as an urgent reminder to the indigenous people of their great cultural heritage comprising sustainable customs and traditions. The roles these poets play as custodians and advocates of their nature-friendly ways of life gain great relevance especially in times when indigenous cultures are endangered and fast losing their moorings to an onslaught of the urban consumer-culture. Besides, these literatures represent the much needed environmental ethics that by lending a voice to the silence of nature can counter the ethics of exploitation and abuse of nature, the unfortunate characteristics of the modern consumer centric world.

REFERENCES

Ao, Temsula. *Book of Songs: Collected Poems 1988-2007.*Nagaland: Heritage Publishing House.2013.Print

Chandra N. D., and Nigamananda Das. *Ecology, Myth, and Mystery: Contemporary Poetry in English from Northeast India*. New Delhi: Sarup & Sons.2007.Print

Daruwalla, Keki N. "Poetry and the Northeast: Foraging for a destiny." *The Hindu: Literary Review,* November7.http://www.thehindu.com/lr/2004/11/07/stories/2004110700350500.htm.

Ed Misra, Tilottoma. *The Oxford Anthology of Writings from North-East India-Poetry and Essays,* , New Delhi: Oxford University Press. 2011.Print.

Nayar, Pramod,K. *Contemporary Literary and Cultural Theory- From Structuralism to Ecocriticism*,New Delhi:Pearson,2010.Print.

Nongkynrih, K. S. *The Yearning of Seeds*. New Delhi: HarperCollins Publishers.2011.Print

Critiquing Pantheism: A Religious Dogma or a Literary Trope?

Krishna Majumdar

For the readers and students of Literature, the word 'Pantheism' is a very familiar one. Actually it is an ideological construct which seems always to be true. It denotes the belief that God is equal to the universe or Nature. In ancient literature of Hinduism also, we find this belief. It says that there is a sublime relation between God and Nature. Pantheism is highly discussed in the Greek philosophy also. In today's literature, it is treated as spirituality and we know that spirituality inheres in the tranquil state of mind. A thorough clarification of Pantheism tells that we cannot think about God, the Almighty, without the awareness of the Universe; its forces and laws and at the same time paradoxically, the universe, conceived as a space without God, will be the symbol of nothingness. Pantheism is doubtlessly a noble belief that the Universe and God are totally identical. The present article seeks to focus on the literary expression of Pantheism both in the Eastern and Western perspectives.

In the literatures associated with Hinduism, we find God to be Omnipresent, i.e. existent everywhere in Nature. All the natural elements are God's creations – Nature is the creation and God is the creator. In other words, whatever is beyond our imagination; God is supposed to exist even there. The exponents of this creed hold that there are links between the cosmic, the physical and the biological in the spiral arms of a galaxy and different natural elements or objects are the different phases of God. Hindus worship those phases of God. They believe that there are as many as thirty-three crores of Gods in the Hindu pantheon. It is because of such a belief-system, they are Pagans, Pantheists, Universalists and Animists. To them, 'worship' is an Abrahamic word.

In Bengali literature, 'Pantheism' means immanence. The writers regard the Universe as the manifestation of God. They do not believe in a concrete personal God, rather in a broad range of doctrines in the forms of relationships between reality and divinity. Because of such a world- view, the concept of God has gradually emerged as a dominant literary trope in glorifying nature. Nature worship in Bengali literature considers *Brahma* as the sole creator. Hindus believe that the Laws such as that of *Karma* are made by God for all human beings. *Brahma* created four types of existence: Gods demons, a creator and men. They

narrate, God does not have any individual personality; God is everywhere, in all natural phenomena. So, here we find a multi-level pantheism. As we all know that the term, "Pantheism" comes from two Greek words (Pan/all) and (theos/God); so a pantheist does not find any difference between deity and reality. God contains all the objects. Everything is, in some way or the other, identified with God. In Bengali Literature, we find this notion to be greatly swallowed by different poets and the New Age Religion is the heart-core document of this notion. We are passing through the age of computer or the age of science. But the philosophy of Pantheism is still being incorporated in different literary forms in different languages.

In Hinduism, the *Brahma* is the Absolute the measureless, the fundamental consciousness, and some extend the concept to some 'Anirbochaniya" *Brahma* who is Self- Luminous and Self -Proven. A systematic analysis of the works of Rabindranath Tagore also showcases the influences of serenity and purity which are the creations of *Brahma*. In *Bhanu Singher Padavali*, Rabindranath Tagore has followed the lilt- music of *Vaishnava Padavali*. That religious side is imbibed by him through the media of expression. The images or elements used in *Padavalis* are of common nature. The natural phenomena serve as the dominating feature of his images.

Turning to the West, one finds that William Wordsworth regarded natural objects, the streams, the hills, the flowers, the winds as his companions. He believed that nature is the reflection of the living God– the spiritual relationship between man and Nature. He explained his gladness and sensitiveness to Nature by the doctrine that the child comes straight from the creator of Nature. This kinship with Nature and God which enlightens childhood, is extended through a man's whole life. We find this lesson in the poem, *Tintern Abbey*. In this poem, Wordsworth showed that the best part of our life is the result of natural influence. The natural pleasure, simplicity, innocence are the best friends of all human beings. Nature is the temple and God stays happily there. Pantheism denotes this sublime fragrance of perception which we all should imbibe. It is this element of Pantheism that makes Wordsworth's *Tintern Abbey* in the opinion of a critic named Dr. Henry Stephen, an instance of a 'new theory of poetry' – that the true poet is influenced by a power deeper than his own individual appeal. What is revealed to the senses is the outward manifestation of a power which at the same time reveals itself to his mind inwardly, and he has his 'hours of visitation from the Most High God.' Understandably, such rare moments of visitations

alone can calibrate the poet's being into the 'World-Soul' that acquires the penetrating vision into what is known as 'the life of things'.

Tagore as a Hindu also asserts a pantheistic view of God in *Gitanjali*, his *magnum opus.* Though pantheism means the presence of God in everything (and hence the godhood of everything), Tagore seems to be addressing one God and supplicating Him alone with fall submission. Just like William Wordsworth, Tagore's pantheism was refracted through the world of nature. In his writings such as "The Vision" from "The Religion of Man," Tagore confirmed that his own daily life began with a keen look of the natural objects. He wrote in one context: "… before going to take my bath, I stood for a moment at my window." It is all about this deep sense of divine communion and sacred inspiration. In his article "The Poet's Religion" and in "Creative Unity," he clarified that the ultimate truth of a man is not in his intellect but in his illumination of the mind.

Thus both in East and West, Pantheism emerged as a religious dogma but instead of remaining as a creed, it became a fillip to creative imagination.

References:

Tagore Rabindranath. *Creative Unity.* London: Macmillan, 1921

Tagore Rabindranath *Gitanjali*. London, Macmillan, 1913.

Tagore Rabindranath. *The Religion of Man*. London : Allen & Unwin 1931

Tagore Rabindranath. *Bhanu Singha Thakurer Padavali.*

Columbia, USA: Create Space Independent Publishing, 2018.

Invasive species: The biological form of environmental pollution

Mr. Koushik Debbarma
Guest Lecturer

Melting icebergs and rising sea levels aside, what do we actually know about environmental pollution? Many of us are mostly ignorant about the fact that, human beings have successfully destroyed countless ecosystems and habitats in search of resources and a better life. But perhaps it is poetic justice that, in doing so, we have achieved the total opposite of what we initially aimed for.

According to WHO, air pollution is the most threatening form of pollution in existence today. The website of WHO's says that *"air pollution poses a major threat to health and climate. Ambient air pollution accounts for an estimated 4.2 million deaths per year due to stroke, heart disease, lung cancer, acute and chronic respiratory diseases."* These are the official numbers but there might be thousands more unaccounted ones who have fallen to this silent pandemic.

In 2020, health experts in New Delhi have credited the increasing levels of air pollution for a near 15% rise in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) or Asthma patients. This is a very alarming number and if it is left without any positive action, the populace of New Delhi will slowly choke to the very air that they breathe.

Cancer is another deadly disease that have caused havoc among human beings and destroyed countless families, and as we read this, it still does not have a cure. About 1500 lung cancer cases in 2015 were attributed to air pollution in France. The numbers from the same year in third-world, developing and under-developed countries will most likely show an ascending curve if there were proper collection of data from verified sources. This is a cause for worry not only because people are developing cancer just by breathing air, but due to the fact that, these pollutants cause mutations or errors in our DNA, the core of our biological make up, and sometimes these mutations are passed on and inherited by the next generation. Hereditary diseases have long existed but inheriting cancer is not something anyone wants to experience.

In biological life, humans specifically are fragile and our body is easily altered by external factors such as the quality of our air, water and the environment.

Air, water and soil pollution are the major components of what people in general experience as environmental pollution. It is perhaps a subjective opinion, but, the scope of environmental pollution extends way beyond the periphery of what we classify today within its sphere. And as deadly as these three are, we also need to consider the pollution of natural habitats in a particular ecosystem through the introduction of invasive alien species.

As defined by Wikipedia, *"Pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse change."* These invasive species do cause adverse and damaging changes to the environment they are introduced to, and hence can be classified as contaminants if we look at the definition of pollution in a broader way.

The introduction of *Clarias* gariepinus (Thai Magur), an invasive African catfish species in India during the 1990s, is causing threat to the aquatic biodiversity of certain places in India due to its high growth rate and larger amount of egg production compared to its Indian counterparts which is resulting in population explosion of this species out of its natural habitat. Another factor that contributes to their increase in population is the lack of natural predators which is supposed to help regulate a particular ecosystem. These factors can cause imbalances in the food chain and destroy the ecosystem of that particular area, ultimately affecting us humans.

Due to this, the native species have to compete for space and resources in their own habitat and some are even reduced to the status of being threatened.

Another example of similar nature is the introduction of the Asian carp in the United States. Carps are not native to North American waters but were introduced by people over the course of time. Because of this, people now have to deal with the over explosion of this invasive species in their waters which is destroying the ecosystems of their local water bodies. Asian carp causes serious damage to the native fish populations in the lakes and rivers that they infest because they out-compete other fish species for food and space. Carps are also thought to lower water quality, which can kill off sensitive organisms like native freshwater mussels.

Several examples like these exist and this should indicate that invasive species introduced in a foreign habitat is a form of pollution that might have long term effects on the biodiversity of a particular ecosystem. Animals, including humans, are conditioned by their particular environments. If the balance in their ecosystem is destroyed, just like air pollution destroys the environment, albeit, in a larger scale, the cost can be higher than we can imagine in the long run.

Even now, around 1.4 trillion dollars are spent globally to manage and control invasive species. If this is not done properly, we might be witnessing live extinction of several species in near future.

References:

Bagchi, Joymala. (2020, 19 October). *With dip in air quality in Delhi, health experts witness 15% rise in COPD/Asthma cases.* Accessed 11.08.2021.<<https://www.livemint.com/science/health/with-dip-in-air-quality-in-delhi-health-experts-witness-15-rise-in-copd-asthma-cases/amp-11603078332646.html>>.

Day, R. (2018, 15 January) *Opinion: Invasive species threaten sustainable development*.10.09.2018.<< https://www.devex.com/news/opinion-invasive-species-the-hidden-threat-to-sustainable-development-91747/amp >>

Gul, S., Mir, Shakir A., Mushtaq, Z. & Qayoom, U. (2020). *Thai Magur: An Invasive Alien species.* Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/344902381_Thai_Magur_An_Invasive_Alien_species .*Asian Carp Overview - Mississippi National River and Recreation Area.* (2019, 24 June). 18.09.2019<<https://www.nps.gov/miss/learn/nature/ascarpover.htm>>

Kulhánováa, I., Morelliab, X.,Tertre, A.L., Loomis, D., Charbotel, B., Medina, S., Ormsby, J.N., Lepeule, J., Slama, R. & Soerjomataram, I. (2018). *The fraction of lung cancer incidence attributable to fine particulate air pollution in France: Impact of spatial resolution of air pollution models.* Accessed on 11.08.2011.<< https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018312236 >>

Vineisand, Paolo & Husgafvel-Pursiainen, Kirsti. (2005). *Air pollution and cancer: biomarker studies in human populations.* Department of Epidemiology and Public Health, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Norfolk Place, W2 1PG London, UK and 1Department of Industrial Hygiene and Toxicology, Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Accessed on 08/08/2020.<< https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://academic.oup.com/carcin/article-pdf/26 11/1846/7512496
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://academic.oup.com/carcin/article-pdf/26/11/1846/7512496/bgi216pdf&ved=2ahUKEwjcwP7PtfbyAhXuumMGHXhjC1IQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1SGYLpd9dFzhYfhOOwGfo>>

Gul, S., Mir, Shakir A., Mushtaq, Z. & Qayoom, U. (2020). *Thai Magur: An Invasive Alien species.* Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. Retrieved from:https://www.researchgate.net/publication/344902381_Thai_Magur_An_Invasive_Alien_species .*Asian Carp Overview - Mississippi National River and Recreation Area.* (2019, 24 June). 18.09.2019<<https://www.nps.gov/miss/learn/nature/ascarpover.htm>>

Day, R. (2018, 15 January) *Opinion: Invasive species threaten sustainable development*.10.09.2018.<< https://www.devex.com/news/opinion-invasive-species-the-hidden-threat-to-sustainable-development-91747/amp >>

রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তায় গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের প্রসঙ্গ ও প্রচেষ্টা : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. অর্চনা দণ্ডপাঠ
সহকারী অধ্যাপিকা (বাংলা বিভাগ)
নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়
উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার মূলে ছিল তাঁর গভীর স্বদেশপ্রীতি। একসময় রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত হয়ে পদ্মানদীর তীরে বসবাসকারী গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ নিত্য শুনতে পেতেন। তারা যে কত বড়ো অভাগা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে তিনি হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভব করেছিলেন। আর তখনই রবীন্দ্রনাথের মনে শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করবার একটা প্রেরণা জেগে উঠেছিল।

"যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। ....কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই।"[১]—এ শুধু রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতামত প্রসঙ্গেই নয়, তাঁর শিক্ষাচিন্তা এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষের একজন অগ্রণী বুদ্ধিজীবী হিসেবে ইংরেজ প্রবর্তিত অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার তথা এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংগতিহীনতার বিষয়টিকে উপলব্ধি করেছিলেন। তখন সেই পরাধীন ভারতবর্ষে তথা আমাদের দেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একটি হল টোল চতুষ্পাঠী, মক্তব মাদ্রাসার দেশজ শিক্ষা, অন্যটি হল ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা। এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিয়ে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত।

'শিক্ষার হেরফের' রচনাকাল (১২৯৯, ইং ১৮৯২ খ্রিঃ) থেকে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ রচনা করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং নানা আলাপ-আলোচনায় গ্রামীণ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নিজের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এইজন্য দেশের প্রচলিত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে নিতান্ত বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর এই নেতিবাচক ক্রিয়াটিই পরে ইতিবাচক কর্মের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা পেল যখন তিনি শান্তিনিকেতনে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, আরো সতেরো বছর পরে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন (আইনসম্মত উদ্বোধন হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে) ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় পল্লী সংগঠন বিভাগ। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পল্লী সংগঠন বিভাগ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা 'শ্রীনিকেতন' নামে ভূষিত হয়। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন।

আসলে মানব সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি হল তার শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের এই ভারতবর্ষ হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি। আর্যদের এদেশে আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষ একটি

সুসভ্য দেশ ছিল, ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষা। প্রাচীন সেই ধারার সঙ্গে আর্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা মিলিত হয়ে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা আর্যদের দানেই গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সুসংগঠিত এবং এর লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট ও গতিশীল। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য তৎকালীন জীবন দর্শন ও সমাজ জীবনের বিচিত্র প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

কিন্তু দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রে গ্রামীণ মানুষের একটি বড়ো অংশ স্বাধীনতার এত বছর পরেও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে। আর তাদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হল অশিক্ষা। ভারতীয় গ্রামীণ মানুষের একটা বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ফলে তার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলি মেটাতে পারে না। জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে গ্রামীণ মানুষদের এই অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার আগে গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বিনোবা ভাবে প্রমুখ মনীষীরা গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষাকমিশনও (রাধাকৃষ্ণান কমিশন -১৯৪৮-৪৯) গ্রামীণ বিশ্ব বিদ্যালয় গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল।

জানা যায় "১৭৫৭ সালের পূর্ববর্তী ভারতে গ্রামীণ মানুষদের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য মূলত দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল— হিন্দু জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালা এবং মুসলিমদের জন্য মক্তব। দেখা গেছে, তিন-চারটি গ্রামের মধ্যে মাত্র একটি পাঠশালা বা মক্তব চলতো এবং দূরদূরান্ত থেকে মূলত ছাত্ররা সেখানে পড়াশোনা করতে আসতো। শিক্ষা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কোন আগ্রহ ছিল না। পেশাগত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের কোন প্রতিষ্ঠান সে যুগে ছিল বলে জানা যায় না। অবশ্য গুরু বা ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা বিশেষ কোন পেশায় বা কাজে প্রশিক্ষণ নিতে পারত। পিতা-মাতার কাছ থেকেও পারিবারিক পেশায় অনেকের হাতেখড়ি হত। পরিবারই ছিল সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। পুরোহিত, সাধু-সন্ত, মৌলভি এবং ফকিরদের কাছ থেকে গ্রামের মানুষ ধর্মশিক্ষা পেত। রামায়ণ ও মহাভারত তাদের বিনোদন জোগানোর পাশাপাশি নীতি শিক্ষাও দিত।"[২] ভারতবর্ষে প্রায় ২০০ বছর ধরে রাজত্বকালে ইংরেজরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশংসনীয় কর্মসূচী হাতে নিলেও গ্রামীণ মানুষের শিক্ষা-উন্নয়নে তাদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। ইংরেজ অফিসগুলিতেও সস্তা দরের কেরানি যোগান দেবার জন্য তারা মূলত শহরকেন্দ্রিক শিক্ষালয় স্থাপন করেছিল। গ্রামীণ পাঠশালা ও মক্তবগুলি সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। কালক্রমে সেগুলি অবলুপ্ত হতে বসে।

এই ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তাই রবীন্দ্রনাথকে প্রবুদ্ধ করেছিল শিক্ষা বিষয়ক নতুন ভাবনায়। যদিও এর একেবারে মূলে ছিল তাঁর নিজের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা, যা যুগপৎ নিরানন্দ ও তিক্ত। পরে শিলাইদহ পর্বের শেষের দিকে নিজের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঘরোয়াভাবে গৃহবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; কিন্তু তা পুরোপুরি সফল হয়নি। শিক্ষাদানের পদ্ধতি কী হওয়া উচিত সেই ভাবনার সূত্রপাত এই সময়ে। মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়, কোন্ শিক্ষা মানুষকে তার সার্থকতায় পৌঁছে দেয়— শিক্ষা তত্ত্বের এইটি হল মৌল প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, প্রতিটি দেশের শিক্ষাবিধিকে যথার্থ হতে গেলে তাকে কয়েকটি মৌল শর্ত পূরণ করতে হয়, তারমধ্যে প্রথমটি হল 'আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব।' দ্বিতীয়-শিক্ষা যেন স্ব-দেশের সঙ্গে, জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের মনের মতো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন, সেই ১৯০১ সালে তাঁর সামনে ছিল দুটি মডেল— একটি হল দেশজ পুরোনো মডেল, দ্বিতীয়টি হল ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির

মডেল। রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝেছিলেন যে, তপোবনের আদর্শকে আর বোধহয় ফিরিয়ে আনা যাবে না; আর ঔপনিবেশিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি ছিল— এই শিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট সুনিশ্চিত তত্ত্ব নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই—এইপর্বে ইংরেজি শিক্ষা কেবল মানুষকে কেরানিতে পরিণত করে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত করে। ফলে শিক্ষার যে অপরিহার্য ভিত্তি—সৃষ্টিশীলতা-মুক্তি ও আনন্দ সর্বদা অবহেলিত হয়। তাছাড়া, ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই শিক্ষার কোনো সংযোগ না থাকায় ভারতবাসীর পক্ষে এ শিক্ষাগ্রহণ দুর্বহ শুধু নয়, দুর্বিষহ। আরও মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, শিক্ষার বিষয়গত সীমাবদ্ধতা শুধু নয়, শিক্ষা মাতৃভাষায় না হওয়ার ফলে সাধারণের কাছে তার অর্থ পৌঁছয় না, শিক্ষা সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ হয়ে থাকে। তাই তিনি শিক্ষাকেই দেশের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো সংকট বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

তাই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের মনের মতো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন তখন তাঁর সামনে যে ছিল দুটি বিকল্প আদর্শ বা ছাঁদ বা দুটি বিকল্প মডেলে ছিল তার কোনোটিকেই গ্রহণ করলেন না। তিনি তাঁর বিদ্যালয়কে গড়ে তুললেন সম্পূর্ণ অভিনব এক তৃতীয় মডেল। তাই "যে দেশজ ও পুরানো মডেলকে রবীন্দ্রনাথ পরিহার করলেন সেদি কী চরিত্রের? মনে রাখতে হবে, সেটি কিন্তু প্রাচীন ভারতের তপোবনের মডেল নয়, সে হল প্রচলিত সাবেক শিক্ষাবিধির মডেল, অর্থাৎ এক দিকে টোল-চতুষ্পাঠী এবং অন্যদিকে মক্তব-মাদ্রাসার মডেল। এইটিই আমাদের পরিচিত-অতীতের শিক্ষাবিধির মডেল, তপোবন কোন্ সুদূর অতীতে ছিল, কোথায় ছিল, কেমন ছিল তার প্রায় কিছুই আমরা জানি না। কোনো এক সময়ে এই টোল-চতুষ্পাঠী বা মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাবিধি হয়তো দেশোপযোগী এবং কালোপযোগী ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কালে তা যে দেশের জীবনপ্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-না দেশোপযোগী, না কালোপযোগী, এই সত্য রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন যে, তা এখন বন্ধ্যা, তার মুখ ইতিহাসের উল্টো দিকে।"[৩]

আবার ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার ছিল না। তাই ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজ সাবেকী ব্যবস্থার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের যৌবনে সাবেকী ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। জানা যায়, "সাবেকী বিদ্যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের টোল চতুষ্পাঠীর সংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের হিসেব থেকে এই ভাঙনের চেহারাটা স্পষ্ট হবে। হিসেবটা ১৮১৮ থেকে ১৮৮৩, এই ৬৫ বছরের। এর ভিত্তি ওয়ার্ড, উইলসন, এ্যাডাম, কাউয়েল ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এঁদের রিপোর্ট। এইসব রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ৬৫ বছরের মধ্যে নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা কমে ৩১ থেকে ১৩-তে এবং ছাত্রের সংখ্যা তমে সাড়ে সাতশ' থেকে কিঞ্চিদধিক একশ'-তে এসে দাঁড়িয়েছিল-তাও ভাটপাড়ার টোল ও ছাত্র ধরে। সন্দেহ নেই, বিংশ শতকের মুখে, রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবছেন, ততদিনে এ সংখ্যা আরো অনেক হ্রাস পেয়েছে। টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা তখন আর ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণনীয় নয়। সাবেকী ব্যবস্থায় শিক্ষার বিকিরণ অবহেলিত ছিল না— এই একটি প্রশংসাবাক্য ছাড়া এরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আর একটিও বলার মতো কথা খুঁজে পাননি।"[৪]

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার আসল প্রতিদ্বন্দ্বি হল ইংরেজ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ একটি বা দুটি নয়, অনেকগুলি। এখানে তার প্রধান আপত্তি তিনটি, বা তিন গোত্রের। সেগুলি হল— "এক, ঔপনিবেশিক শিক্ষার পেছনে কোনো সুচিন্তিত কেন, কোনোরকম শিক্ষাতত্ত্বই নেই। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই, তদনুযায়ী কোনো পরিকল্পনা নেই। বরং বলা যায়, কুপরিকল্পনা আছে—সে হল শিক্ষা দিয়ে

মানুষকে কেরানিতে পরিণত করা, ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত করা। ফলে সৃজনশীলতা, মুক্তি ও আনন্দ, শিক্ষার যা অপরিহার্য ভিত্তি, এ শিক্ষায় তা সম্পূর্ণ অবহেলিত। এক কথায়, এ শিক্ষা শিক্ষাই নয়, এ হল এক ধরনের বিষক্রিয়া।

দুই, এ শিক্ষার দাঁড়াবার কোনো ভূমি নেই। ঐতিহ্যের সঙ্গে, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে -দেশের চিত্তের সঙ্গে এ শিক্ষার কোনো যোগ নেই। অর্থাৎ এ শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে সত্য নয়।

তিন, আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক হলেও, আধুনিকতার বাইরের খোলসটাই এর লক্ষ্য, আধুনিকতার মর্মসত্যের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কালের প্রবাহের সঙ্গে, ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক কেরানি- তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরের কোনো যোগ থাকা সম্ভব নয়।"[৫]

এখানে রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি তত্ত্বগত আপত্তি ছাড়াও আরো কয়েকটি বাস্তব এবং ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদের কথাও তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিধি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। সেগুলি হল—"এক, শিক্ষার বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, শিক্ষা মাতৃভাষায় না হওয়ার ফলে, একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার মাধ্যমে হওয়ার ফলে, সাধারণভাবে এ শিক্ষা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ—অনেকটা খোলসের মতো, জীবিকার ক্ষেত্রে তা আমাদের অঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ জীবনে তার কোনো ক্রিয়া থাকে না। বিজ্ঞানশিক্ষাতেও তাই, বিজ্ঞান আমাদের জীবনে প্রবেশ করে না। ফলে বিজ্ঞানে যাঁরা সুশিক্ষিত বলে গণ্য, তাঁদেরও জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক থেকে যায়। সোজা কথায়, এ শিক্ষা আমাদের বাইরের চাকচিক্য দিলেও প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত রেখে দেয়।

দুই, এ শিক্ষা দেশের মানুষকে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই ভাগে, বস্তুত দুই স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করে। এতে তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিজেদের শ্রেণীর বাইরে তাদের দৃষ্টি যায় না। এতে দেশের মধ্যে শাসক ও শাসিত এই দুই জাতির জন্ম হয়।

তিন, এ শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। এরমধ্যে জনশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার বিকিরণের কোনো পথ নেই। এর মাধ্যম ইংরেজি বলে, অল্পসংখ্যক শহুরে সংগতিপন্ন লোকই এই শিক্ষা নিতে পারে।"[৬]

আসলে শিক্ষার বিস্তার বা বিকিরণের ব্যাপারে বা শিক্ষাকে খানিকটা জনমুখী করে তোলার ব্যাপারে ইংরেজ-পূর্ব ভারতে সাবেকী ধারার যে ব্যবস্থা চালু ছিল, ঔপনিবেশিক শিক্ষার জনসাধারণ - বিমুখ ব্যবস্থার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাছে তা অনেক প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় সেই সাবেকী ব্যবস্থাও লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়—

"এক। শিক্ষাকে নতুন কাঠামোয় সাজানো।

দুই। গ্রামগুলিকে নতুন জীবন দান করা।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ বিরুদ্ধ ভাগ্যের চরম নির্মমতা ভেদ করে বিশ্ব জগতের কাছে মনুষ্যত্ব সাধনার তীর্থভূমি রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। সর্বভারবহনকারী রূপে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে তিনি নিজের কর্মসাধনার ক্ষেত্রটি সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সাধনার সঙ্গী, কর্মী, বন্ধু ও ছাত্রদের কাছে। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, যশ-অপযশ থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সেদিন কবির কাছে একমাত্র কাম্য বিষয় হয়ে উঠেছিল বহুল পরিমাণ নির্জন অবকাশ ও মঙ্গলকার্যের বৃহত্তর ক্ষেত্র। কবি যেন অনুভব করতে থাকেন জগৎ ও জীবনের সাথে, মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ বেদনার বিপরীতে একান্তই নিজের জন্য বিশেষ কিছুই তখন তাঁর প্রয়োজনীয় নয়। পরবর্তীকালে আশ্রম বিদ্যালয় থেকে দূরে যাবার সময় এলে বারবার এই দুর্গম দুঃসাধ্য কর্মে

প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। আসলে ব্যক্তিজীবনের শৈশবস্মৃতি, গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অসহনীয় যাপনযন্ত্রণা তাঁকে প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের অবাধ আতিথ্য, উদার মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল দীর্ঘদিন। তিনি সেদিনের সেই দুঃসহ বন্দি জীবনের যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারেননি। তাই সেদিন শিশুমনের অলিন্দ নিলয়ে মনস্তত্ত্বের কোনো আলো আঁধারিতেই যেন জন্ম নিয়েছিল তাঁর এই আনন্দ নিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত করবার শপথ।

প্রকৃতির উদারক্ষেত্রে আশ্রয় পাওয়া ও ছেলেদের স্থান করে দেবার ঐকান্তিক সেই ইচ্ছাই কবিকে দুঃসহ ত্যাগের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিল। তাই শান্তিনিকেতনে তিনি তপোবনাশ্রিত জীবনচর্যার মাধ্যমে একটি আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্পে সর্বতোভাবে নিমগ্ন হয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই বলেন্দ্রনাথ কর্তৃক আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প মহর্ষিদেবের অনুমোদন পেয়েছিল এবং আর্থিক আনুকূল্যও লাভ করেছিল। আর এই আনুকূল্যে আশ্রমের একতলা গৃহের নির্মাণকার্যও শুরু হয়েছিল। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ মূলত সেখানে একেশ্বরবাদী সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাই করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষাও দেওয়া হবে। তাঁর সেই ইচ্ছানুযায়ী ২১ ডিসেম্বর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন, কিন্তু তার আগেই ১৯ আগস্ট ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মারোগে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলেও বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়নি। এরপর বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই বছর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই আরব্ধ কর্মকে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সফল করবার জন্য এগিয়ে এসে ৭ই পৌষ ১৩০৮ -এ (২২ ডিসেম্বর, ১৯০১ খ্রিঃ) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাও ছিল যথেষ্ট রক্ষণশীল। তবুও তা সেযুগের পক্ষে যথেষ্ট অভিনব, আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ এবং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত হলেও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের প্রথম পর্যায়টি রবীন্দ্র-মানসিকতার ও অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তারও তেমন তথ্যনিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিক রূপটিকে প্রতিফলিত করে না। আসলে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় —স্থাপনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা জোগানো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আর সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতন শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

সার্বিকভাবে শিক্ষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার পাশাপাশি তিনি বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন সেই 'বালক' পত্রিকা প্রকাশের সময়কাল থেকেই। কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীলতা পার হয়ে নতুন যুগে পা রাখতে গেলে শিক্ষাই যে নারীজাতির আয়ুধ —একথা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ সংসারে মেয়েদের আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানের জন্য বুদ্ধি ও বিদ্যাচর্চার আবশ্যিকতার কথাও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি তাদের শিক্ষাপ্রণালীর স্বতন্ত্রতার কথাও বলেছিলেন। 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী লীলা মিত্রের একটি পত্রের উপরে টীকা-টিপ্পনীরূপে লেখেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে তিনি লেখেন, স্ত্রীলোকের জন্য এমন শিক্ষারই আয়োজন করতে হবে যাতে তাঁরা পুরুষের যেন সংকটের সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী ও সুখে দুঃখে সহচরী হয়ে সংসারপথে তার প্রকৃত সহযাত্রী হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠির মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে লেখেন—"যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই। ....বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের।

যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?"[৮]

শিক্ষা যদিও আসলে অখণ্ড ও অবিভাজ্য একটি বিষয়, তাহলেও কার্যক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায় শিক্ষার প্রথম তথা চরম উদ্দেশ্য-উচ্চতর আদর্শ হল মনুষ্যত্ব লাভ বা মনুষ্যত্বের বিকাশ। আর দ্বিতীয় তথা নিম্নতর লক্ষ্য হল জৈব অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষা বা জীবিকার জন্য শিক্ষা। একটি ভাষণে এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন—"...সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন।"[৯] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আদর্শকে এইভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

"অ। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য—

(১) শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ

(২) শিক্ষা ও সৃজনশীলতা

(৩) শিক্ষা ও স্বাধীনতা

আ। শিক্ষার নিম্নতর বা ব্যবহারিক লক্ষ্য :—

(১) শিক্ষা ও জীবিকা

(২) বৃত্তিমুখী শিক্ষা

(৩) টেকনলজি শিক্ষা"[১০]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য বলতে বুঝতেন ব্যক্তিত্বের সীমাহীন বিকাশ, সর্বপ্রকারের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি, মুক্ত মনের বাধাহীন প্রকাশ এবং মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারশীলতায় সীমাহীন আস্থা ও আপোষহীন যুক্তিবাদ। রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষ্যে একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল মনুষ্যত্বলাভ, জীবনকে সব দিক থেকে উদ্বোধিত করা, প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো, আপনাকে বিকশিত করা, পরিপূর্ণ হওয়া। শুধু মানুষের নয়, এটা সবকিছুরই -বিশ্বজগতেরই গোড়াকার সত্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা।"[১১] আসলে মানুষের সত্যও এখানেই, নিজেকে বিকাশ করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এইটেই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই পরিপূর্ণ মানুষ হবার অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখার নামই হল শিক্ষা।

আর মানুষের সত্য পরিচয় তার জৈবতায় নয়, তার আত্মকর্তৃত্বে, তার স্বাধীনতায়, সৃজনশীলতায়। কবি চিত্রকর গায়ক ভাস্কর না-ও যদি হয়, তবু সব মানুষই শিল্পী। কেননা প্রত্যেক মানুষই জীবনশিল্পী। মানুষ নিজেকে সৃষ্টি, নিজের পরিবেশকে সৃষ্টি করে, মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে, সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সভ্যতা সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা, সব মানুষ, প্রতিটি মানুষ। সৃষ্টিকর্তৃত্বই মানুষের স্বধর্ম। স্বধর্ম অর্জনেই মানুষের মনুষ্যত্বলাভ। 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি কর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাজ, আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে।"[১২]—এটাই মানুষের মূল লক্ষ্য এবং এখানেই মানবজীবনের স্বার্থকতা। তাই আত্মকর্তৃত্ব এবং সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিকাশের জন্য যে সাধনা, তারই নাম মনুষ্যত্বের সাধনা, তারই নাম শিক্ষা। যদিও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব সাধনের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন, কিন্তু শিক্ষার সমাজগত লক্ষ্যও এই ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব সাধনের মধ্যেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ জানেন মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই তিনি বারবার বলেছেন, একলা মানুষ সত্য নয় এবং "সমাজ জীবনের" মধ্যেই মানুষ যথার্থ মানুষ।

"সমাজ জীবনের" মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব সাধন সত্য ও সার্থক হয়। মানুষের ব্যক্তিগত সাধনা এবং সমাজগত সাধনা এখানে অভিন্ন মানুষের এবং মানবকল্যাণ অভিন্ন। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতে ও সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নয়, শিক্ষার লক্ষ্য একই সঙ্গে মানুষের আত্মবিকাশ এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানব বিকাশ।

আবার রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষের জৈব প্রয়োজনকে অস্বীকার করেননি তেমনি মানুষের বাঁচার সংগ্রামকেও অগ্রাহ্য করেননি। তিনি জানতেন, মানুষ এক সঙ্গে প্রয়োজনের জগতের অর্থাৎ জৈববিশ্বের এবং প্রয়োজন-ছাড়ানো জগতের অর্থাৎ মানবিক—বিশ্বের অধিবাসী। সেই জন্যই তিনি শিক্ষার লক্ষ্যকে উচ্চতর এবং নিম্নতর এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। শিক্ষার নিম্নতর বা ব্যবহারিক লক্ষ্য হল বেঁচে থাকার সামর্থ্য অর্জন করা, সোজা কথায় জীবিকা অর্জনের সামর্থ্য লাভ করা। একে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ব্যবহারিক সুযোগ লাভ'। বৃত্তিশিক্ষা, কারীগরি শিক্ষা সবই এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা।

তবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বে উচ্চতর লক্ষ্যেরই প্রাধান্য। কিন্তু তিনি নিম্নতর লক্ষ্যকেও অস্বীকার করেননি। আসলে রবীন্দ্রনাথ সমগ্রতার সাধক তাই মানুষের কোনো দিককেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবার সেই সমগ্রতার দিক থেকে ভেবে দেখলে বলা যায়, উচ্চতর ও নিম্নতর দু'টির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, তাদের সম্পূর্ণ পৃথক করাও স্বাভাবিক নয়। দুটিকে আলাদা কামরায় স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়। তার কারণ চূড়ান্ত জৈবতার মধ্যেও মানুষের মানবধর্ম সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় না, কারণ মানুষ আসলে একটা অখণ্ড সত্তা। এইজন্যই উচ্চতর আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মুখ্য প্রয়োজন আর নিম্নতর আদর্শকে তিনি বলেছেন গৌণ প্রয়োজন। বলেছেন, এ দুইকে মিলিয়ে নিয়েই মানুষের সত্তা। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"...তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক—পারমার্থিককে মিলিয়ে।"[১৩] অর্থাৎ তিনি শিক্ষাক্রমের মধ্যে ব্যবহারিক বা বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়ার কথাও বলেছেন।

ব্যবহারিক সামর্থ অর্জনকে যে রবীন্দ্রনাথ বাদ দেননি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়। আরো বড়ো প্রমাণ শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে তাঁর পল্লী সংগঠন প্রয়াস। এর সবটাই ব্যবহারিক সামর্থ—অর্জনের অভিযান এবং সবটাই তাঁর শিক্ষা প্রয়াসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই সূত্রেই তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন; কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, বয়নশিল্প প্রভৃতি কারু শিল্পশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। কী কৃষি, কী কারু শিল্প, সমস্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের প্রয়োগে উৎসাহী। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাধনাকেও যেমন চেয়েছেন, বিজ্ঞানের প্রয়োগগত দিককে-টেকনলজিকেও তিনি তেমনি চেয়েছেন। তিনি গ্রামে বিজ্ঞান আনতে চেয়েছেন; কৃষিতে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে চেয়েছেন এবং সীমিত ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও তিনি সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। ....মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে আনা চাই।"[১৪] এই প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেছেন—"মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙল, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না।"[১৫]

আসলে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-বাংলার অগণিত সাধারণ মানুষের শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানির গভীরতা ও অপরিমেয় তীব্রতা থেকে তাদের দুর্গতির প্রধান কারণ সম্বন্ধে বুঝেছিলেন শিক্ষার আলো থেকে, সংস্কৃতির সুচেতনা থেকে বঞ্চনা। রাশিয়া ভ্রমণে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ আরো বুঝেছিলেন জনশিক্ষা ছাড়া, সর্বজনীন শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব, এমন-কী অস্তিত্ব বজায় রাখাও। সোভিয়েত-রাশিয়ায়

রবীন্দ্রনাথ যে, শিক্ষাদর্শ দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মূল কথাটাই ছিল উচ্চাঙ্গের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং তা যথার্থই সর্বজনীন। সকলের জন্য শিক্ষা। এতদিন শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এটাই করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পেরে উঠেননি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা তাঁর পল্লীচিন্তা থেকেই তথা গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের জন্যই উদ্ভূত হয়েছিল কারণ তাঁর শিক্ষা ভাবনা গ্রামবাংলার নিরক্ষর ও গরিব মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার মূলে আছে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা— ভারতবর্ষের গ্রাম্যজীবনকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে। কুটিরশিল্পের ভগ্নদশা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিকার্যের গতানুগতিক পন্থা, মহাজনদের ঋণের বোঝা ভারতবর্ষের গ্রামীণ কাঠামোকে ভগ্নদশায় ঠেলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই গ্রাম উন্নয়নের কথা অন্তর দিয়ে ভেবে শ্রীনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলিকে গুরুত্ব দেন। তিনি একথা স্মরণ করতেন বার বার যে, এদেশে যা কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে। শিক্ষার আয়োজন গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। সাংস্কৃতিক সম্পদ নিত্যনিয়ত মানুষকে দিত পূর্ণতার আনন্দ। কিন্তু বিদেশী শক্তির অশুভ প্রচেষ্টায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রাম ও নগরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ গড়ে ওঠে। এমনকি গ্রামে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হয়— ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন অল্প। তাই গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন— 'মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য।"[১৬]

শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিলেন বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রীনিকেতনকে জুড়ে দিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ রূপকে প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯০৬-এ পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র (আশ্রমের দুই ছাত্র) এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠালেন কৃষি ও গো-পালন বিদ্যা শিখতে। ১৯১২ সালে সুরুলের কুঠিবাড়ি কেনা হল। আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করে পূর্ণোদ্যমে শুরু হল পল্লীসংগঠনের কাজ। ১৯২১ এর শেষে ইংলন্ড থেকে এল্‌ম্‌হার্স্ট এসে যোগ দেওয়ায় শ্রীনিকেতন পূর্ণ রূপ পেল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ সব দিক থেকে গ্রামকে স্বনির্ভর করে গ্রামের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি। একে একে ডিসপেনসারি, স্বাস্থ্যসমবায়, ব্রতীবালক সংগঠন, প্রশিক্ষণ শিবির, লোকশিক্ষাসংসদ, শিক্ষাচর্চাভবন, শিল্পভবন, সমবায় সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষিশিক্ষা পল্লীসংগঠন, গ্রামসেবা, পল্লিচর্চা এবং শিক্ষাসত্রের মতো একত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনের মতো এদেশে আর কোথাও নেই।

আধুনিক সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ভোগের প্রতিযোগিতায় উৎকট অসামঞ্জস্যে এবং হিংসার মন্থনদণ্ডে মানুষকে গ্রাস করে নিচ্ছে, তখন তিনি 'বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে' মনুষ্যবিকাশের পথ তৈরি করে দিতে চাইছেন। বিশ্বকর্মের এই যজ্ঞশালায় বিজ্ঞানের মহাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির দানকে আয়ত্ত করার কথা ভাবছেন। এখানেও অসাম্য নয়, বিচ্ছেদ নয়, সহযোগ এবং সমবায়ের কথা। বিশ্বমানবতার কবি কর্মসাধনার পথে শুনতে চেয়েছেন 'পরমযুগের আহ্বানধ্বনি'। শ্রীনিকেতন হল রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষাদর্শ, একটি আধুনিক মডেল। ক্ষমতার বাইরে গিয়ে, সমগ্র দেশের দায়িত্ব নয়, কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে ছোট আদর্শ তৈরি করা এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করা। তিনি বলেছেন, "আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দ প্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।"

শিক্ষা ও পল্লি সংস্কারের সংকল্প নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর আসন বদল করে নিয়েছিলেন। কবি। সে সংকল্প সার্থক করতে পেরেছিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যুগল প্রতিষ্ঠায়।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃঃ ৬৬১।

২. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, মহঃ নিজাইরুল ইসলাম, শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ক্লাসিক বুকস, ২০১২, পৃঃ ৩৬০।

৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্প্রাদিত), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ-শিক্ষাচিন্তা-রবীন্দ্ররচনা সংকলন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৫।

৪. তদেব, পৃঃ ১৫-১৬।

৫. তদেব, পৃঃ ১৬।

৬. তদেব, পৃঃ ১৬-১৭।

৭. তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃঃ ১৩।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীশিক্ষা', শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, মাঘ, ১৪০৭, পৃঃ ২৮৬।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ২, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৩৯৬, পৃঃ ২৪৫।

১০. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ-শিক্ষাচিন্তা-রবীন্দ্ররচনা সংকলন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৩২-৩৩।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃঃ ২৫৯।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশ্রমের শিক্ষা', শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বিশ্বভারতী, মাঘ, ১৪০৭, পৃঃ ৩৫০।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি', শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, তদেব পৃঃ ৩৩৪।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃঃ ৩৬৬।

১৫. তদেব, ৩৬৬।

১৬. পল্লি প্রকৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃঃ ১১৩।

বিজ্ঞানভাবনা ও বিদ্যাসাগর

দীপান্বিতা দাশগুপ্ত
অবসরপ্রাপ্ত এসোসিয়েট প্রফেসর
গভঃ ডিগ্রি কলেজ, খুমুলুঙ, পঃ ত্রিপুরা

দু'হাজার কুড়ি সালটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ (১৮২০-৯১)। এই উপলক্ষে বিভিন্ন উদ্যোগে নতুন নতুন আলোকে, আঙ্গিকে বিদ্যাসাগরকে দেখবার, আবিষ্কার করবার একটা চেষ্টা চলছে। বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড়শত বৎসর উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (সম্পাদনা করেন গোপাল হালদার মহাশয়) তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রায় সবটাই এই তিনখণ্ডে ধরা রয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে; এমনকি অতি সম্প্রতি, সংস্কৃত কলেজের সিন্দুক থেকে তাঁর বেশকিছু চিঠিপত্র ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ উদ্ধার করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর রচনাবলী ছাড়াও বিদ্যাসাগরকে জানবার, চেনবার জন্য আরও বহু সমকালীন ও আধুনিক উপকরণ রয়েছে। এইসব উপকরণের প্রথমটি হলো শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের—যিনি ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সহোদর ছিলেন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে, তবে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে। এই গ্রন্থটির কিছু অংশ স্বয়ং বিদ্যাসাগরের রচনা। অন্য দুটি সমকালীন গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন; সে দুটি হলো — (ক) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর (১৮৯৫) এবং (খ) বিহারীলাল সরকারের বিদ্যাসাগর (১৮৯৫)। কম-বেশী বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে বিদ্যাসাগর চর্চার কয়েকটি হলো—(ক) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ইন্দ্রমিত্র (১৯৬৯), (খ) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, ১৯৭৩ (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ —বদরুদ্দিন উমর, ১৯৭৪ (ঘ) Vidyasagar : The Traditional Moderniser-Amalesh Tripathi, 1974 (ঙ) প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর-বিমান বসু, স., ১৯৯১ ইত্যাদি। এছাড়াও বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবর্ষ (১৯৯১), বর্ণপরিচয় প্রকাশের দেড়শ বছর ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষেও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখবার আয়োজন শুরু হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের নানান কর্মকাণ্ডের কথা বহুল প্রচলিত। একাধারে তিনি পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক, গ্রন্থকার, গ্রন্থপ্রকাশক, শিক্ষা সংস্কারক—বিদ্যালয় স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুক্তিসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রবর্তক; সমাজ সংস্কারক বিশেষতঃ বিধবাবিবাহ প্রবর্তন—যা তিনি "তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম" বলে মনে করতেন; সর্বোপরি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী। একই সঙ্গে কঠিন ও কোমলের সমন্বয়ের নামও বিদ্যাসাগর। তাঁর সম্পর্কে বিশেষণের এ কয়েকটি সামান্য মাত্রই। সব বিশেষণগুলি একত্রিত করলেও সম্পূর্ণ বিদ্যাসাগরকে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না। বরং যে সময়কালে তিনি জন্মেছিলেন, সেই সময়কালের প্রেক্ষাপক্ষে তাঁর কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে তাঁর সর্বজনীনতা উপলব্ধির পথে খানিকটা অগ্রসর হতে পারবো এবং বুঝতে পারবো কেন তিনি এখনও প্রাসঙ্গিক।

জন্মের দ্বিশতবর্ষে, এখন, আমরা কোন্ প্রেক্ষাপটে তাঁকে দেখব সেটিও আলোচনার বিষয়। দ্বিশতবর্ষকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু আলোচনা, গ্রন্থ প্রকাশ শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকবছর ধরে তা চলবেও।

তার কিছু স্থায়ী হবে, ভবিষ্যৎ পুণর্মূল্যায়ণের অপেক্ষা করবে। তবে, বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড়শতবর্ষে, মৃত্যুর শতবর্ষে বা গত পঞ্চাশ বছর ধরেই যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার বিষয়টি খুব বেশি উঠে আসেনি। সুখের কথা, জন্ম দ্বিশতবর্ষে তার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর যুক্তিবাদী, বিদ্যাসাগর মানবতাবাদী। যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন দ্বৈরথ নেই; বরৎ বিজ্ঞানের ভিতের ওপরেই এদের অবস্থান। যিনি যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী তাঁর তো একটা বিজ্ঞান মনন থাকবেই। এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সেই বিজ্ঞান মননকেই খোঁজার চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ করে রাখা ভালো, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরকে 'বিজ্ঞানী' বানানো নয়, তাঁর সত্যানুসন্ধানের ভিত্তিটি যে আসলে বিজ্ঞানেরই ভিত্তি তাকে দেখতে চেষ্টা করা।

আলোচনা শুরু করা হবে, বিদ্যাসাগর রচিত পুস্তক, বিশেষতঃ শিশুপাঠ্য পুস্তক দিয়ে, পরে তাঁর অন্যান্য কার্যকলাপের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে। আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনার সংখ্যা কম; বেশির ভাগ রচনা সময় ও প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থেকে অনুবাদ, যদিও সেগুলি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তিনি অনুবাদগুলির সার্থক ভারতীয়করণ ও বঙ্গীকরণ করেছিলেন।

ছোট বা বড়, যে কাউকেই যদি বিদ্যাসাগরের দুটি শিশুপাঠ্য পুস্তকের নাম জিজ্ঞেস করা হয় উত্তর আসবে বর্ণপরিচয় এবং বোধোদয়। যদিও বর্ণপরিচয়ের মতো বোধোদয় বহুল পঠিত নয়। বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান মননের ছাপ রয়েছে বোধোদয়ের ছত্রে ছত্রে যা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। বোধোদয় প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন "....অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি.....।" এখানে দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য— (ক) "অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি"—শিশুরা তাঁর লক্ষ্য— যাদের কাছে সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন সত্য তিনি তুলে ধরেন, শিক্ষার ভিতটিকে সত্যের ওপর, বিজ্ঞানের ওপর নির্মাণের চেষ্টা করেন; (খ) দ্বিতীয় শব্দটি "বালিকা"—যে সমাজ তখনও মেয়েদের সাধারণ লেখাপড়ার সুযোগ দিতে বিমুখ, সেই সমাজে বিদ্যাসাগর বালিকাদের শিক্ষার ভিতটিও দৃঢ় করে দিতে চান। শিক্ষা যে কেবল বালকদের অধিকার নয়, শিক্ষায় বালিকাদেরও সমান অধিকার রয়েছে—এই সার্বজনীনতাটি তিনি গেঁথে দেন।

বোধোদয় শুরু হয়েছে পদার্থের পরিচিতি দিয়ে। পদার্থকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেছেন—"চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ।" প্রসঙ্গত উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে এই তত্ত্বটি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। চেতন পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, অচেতন পদার্থের সঙ্গে পার্থক্যও বুঝিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এসেছে প্রাণীদের কথা। জানাতে ভোলেননি—"যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্বপ্রধান।" এসেছে বিভিন্ন রকমের জন্তু, পাখি, সরীসৃপ, পতঙ্গ, কীট যেমন পিঁপড়ে, উই ইত্যাদির কথা। তিনি জানিয়েছেন— "এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেক বিধ জন্তু আছে, তাহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ নামক যন্ত্র ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে। এখানে হয়তো তিনি Micro organism বা ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

এরপরের আলোচনা মানবজাতি নিয়ে। আমাদের দেশের মানুষ কাদের সঙ্গে, কোথায়, কিভাবে বাস করে, দিনযাপন করে, কি কি ভাষা ব্যবহার করে, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির আলোচনা। লক্ষ্যনীয় হলো নিদ্রা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—"আমরা নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি।" স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা তখন এদেশে কেন, ইউরোপেও শুরু হয়নি। আর সেজন্যই তারপরেই তিনি লেখেন—"স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্র,

কার্যকারক নহে।" স্বপ্ন কার্যকারক কি অমূলক তা বোঝবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, ঊনিশ শতকের শেষে ফ্রয়েডীয় মতবাদের আবির্ভাব পর্যন্ত।

মানুষের আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে ইন্দ্রিয়ের কথা। ইন্দ্রিয়কে তিনি বলেছেন—"জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ"—ইন্দ্রিয় সমূহ যে জ্ঞানার্জনের প্রথম দরজা তা জানাতে ভোলেন নি, যাকে পরবর্তীকালে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন "খবর-দার।" এই আলোচনাতেও বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় মেলে। যেমন 'চক্ষু' সংক্রান্ত আলোচনায় লিখেছেন—"অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাতলা পর্দা থাকে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া ঐ তারা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাতলা পর্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়, তাহাতেই আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে।" আমাদের দেখতে পাবার পেছনে যে বিজ্ঞান তা কি আজও অন্যতর হয়েছে? কর্ণ বা কান সম্পর্কে বলেছেন—"কর্ণকুহরে পটহের (পর্দা বা ঝিল্লী) মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে....শব্দের প্রতিঘাত হয় এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। তবে নাসিকাকে (নাক) উল্লেখ করেছেন কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় হিসেবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাকের ব্যবহার উহ্য রয়ে গিয়েছে। "নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। জিহ্বা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"জিহ্বাতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা তাহার স্বাদ হয়। ত্বক সম্পর্কে বলেন— "ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শ জ্ঞান হইয়া থাকে।" বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।" হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন।"

ভাষার প্রসঙ্গেও মানুষের সঙ্গে জন্তুর তফাতের কথা এসেছে। পশুরা তাদের মনের ভাব বিভিন্ন আওয়াজের দ্বারা ব্যক্ত করে; মানুষের যেহেতু "বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে"। তাই সে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে। "মনুষ্যেরা মুখ দ্বারা নানাবিধ শব্দের উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে।....শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে এবং ঐ উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা।" অতঃপর, শব্দ কি বা ভাষাই বা কি সে বিষয়ে আর কোন অস্পষ্টতা থাকে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দেশের বাইরেও বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত সে কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগেই বিদ্যাসাগর দ্বিধাহীনভাবে বলেন—"...অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।"

ভাষার পরে আলোচনায় এসেছে "কাল"। এখানে সকাল, বিকেল, রাত্রির সঙ্গে সেই সময়ে প্রচলিত সময়ের বিভিন্ন মান (দণ্ড, হোরা, প্রহর ইত্যাদি) দুটি পক্ষ (কৃষ্ণ ও শুক্ল), ছয় ঋতু, মাস ও বৎসর, শতাব্দীর হিসেব শিখিয়েছেন। এই সঙ্গে জানাতে ভোলেননি যে সব মাসের আয়ু ত্রিশ দিন হয় না, কম বা বেশিও হয়। জানিয়েছেন প্রাচীনকালে বিভিন্ন শাসকরা, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্বৎ, শকাব্দ ইত্যাদি প্রচলন করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন হিজরা এবং খৃষ্টাব্দেরও। একই সঙ্গে জানাতে ভোলেননি যে বাংলাদেশে বৎসর গণনার হিসেবটি (বৈশাখা-চৈত্র) প্রচলিত হয় আকবরের আমলেই।

বোধোদয়ে এরপরের আলোচ্য বিষয় গণনা— অঙ্ক প্রসঙ্গ। বস্তুর সংখ্যা ও মূল্য জানার জন্য "গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক।" "অঙ্ক সমুদায় দশটি মাত্র।" এক থেকে নয় এবং শূন্য। শিখিয়েছেন এক থেকে একশ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার। শতকের পর শিখিয়েছেন সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত ও কোটি অঙ্কের কথা। ভাবতে অবাক লাগবে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগেই তিনি শিখিয়েছেন বিসম (Odd) এবং সম (Even) অঙ্ক। শুধু সংখ্যা শিখলেই হবে না, সংখ্যার পূরণবাচক রূপও শিখতে হবে। কারণ "যদি কেহ

এরূপ লিখে, 'আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কর্ম করিয়াছিলাম' তাহা হইলে তিন দিবসে উহা নিশ্চিত বুঝাইবে না; কেহ এরূপ বুঝিবে, ঐ কর্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল, কেহ বোধ করিবে, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম করা হইয়াছিল।...কিন্তু '৩' এই অঙ্কের পর যদি 'য়' এই অক্ষরের যোগ থাকে, তবে আর কোন সংশয় থাকে না..., কেবল তৃতীয় বুঝাইবে।" পূরণবাচক অঙ্ক লেখা শেখার পর কিভাবে মাসের বিভিন্ন দিন বোঝাতে হবে তাও বলেছেন— যেমন 'পহিলা' (পয়লা), দোসরা, তেসরা ইত্যাদি।

বর্ণ বা রং অধ্যায়ে মৌলিক ও মিশ্র রঙের সঙ্গে সঙ্গে আলোর প্রতিসরণ, সাত রঙের রামধনু কেন হয়, আকাশে রামধনুর অবস্থান ও তার আকার বুঝিয়েছেন। 'বস্তুর আকার ও পরিমাণ' সংক্রান্ত অংশে শিশুদের শেখাচ্ছেন—'সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন।....সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার (প্রস্থ), বেধ — এই তিনগুণ আছে।" বস্তুর উচ্চতাও মাপা যায়। "বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা।" এভাবে সহজে শিখিয়ে দেওয়া হয় বস্তুর আকার, পরিমাণ ও পরিমাপ।

বিভিন্ন ধাতু নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে বোধোদয়ে। এখানে সোনা, রূপো, পারদ ('জলের ন্যায় তরল') সীসা, তামা, লোহা, রাঙ বা টিন, দস্তার আলোচনা রয়েছে। ধাতু যে খনিজ পদার্থ এবং আকর হিসেবে পাওয়া যায় এবং তাকে যে পরিশ্রুত করে ব্যবহার করতে হয়, সে কথাও তিনি জানাচ্ছেন। জীবনধারণের জন্য অন্যতম আবশ্যিক জ্বালানি কয়লা ও কেরোসিন তেলের উৎস, ব্যবহার, প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কেও অবহিত করেছেন।

হীরক এবং কাঁচ শীর্ষক অংশে জানিয়েছেন— সব বস্তুর মধ্যে "হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন।" "বর্ণহীন নির্মল হীরাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য"। হীরার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন- "কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ, প্রয়োজনে আইসে না।" নীতি শিক্ষক বিদ্যাসাগর অতঃপর বলেছেন—"এরূপ প্রস্তরের একখণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত অত অর্থ ব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার প্রদর্শন ও মূঢ়তা মাত্র।"

আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে বোধোদয়ে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ওপর নির্ভরশীলতা সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের শিখিয়ে দেন, এরমধ্য দিয়ে আধুনিক ধারণার পরিবেশ বিজ্ঞানের সঙ্গেও শিশুদের সম্যক পরিচয় ঘটে যায়। জল, নদী, সমুদ্র শীর্ষক আলোচনায় সমুদ্রের জলের স্বাদ সম্পর্কে বলেছেন, "সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা লোনা হয়।" সমুদ্রের জল কেন লবণাক্ত হয় এবং তাতে লবণের পরিমাণ কতখানি বিজ্ঞান তখনও তা আবিষ্কার করেনি, তাই বোধোদয়ে এ সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নেই। তবে সমুদ্রের জল শুকিয়ে যে লবণ তৈরি হয় তা জানানো হয়েছে। সমুদ্রের জলের রং সম্পর্কে বলেছেন, "সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়।" "নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এই পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই", এখানেই বিদ্যাসাগরের অনন্যতা। "এই পর্যন্ত" আবিষ্কৃত হয় নি, তা বলে ভবিষ্যতে যে জানা যাবে না তা নয়। সমুদ্রের গভীরতা মাপার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট মত যে পাওয়া যায়নি তারও উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রে জোয়ার, ভাটা কেন হয়, গভীর সমুদ্রে কম্পাসের প্রয়োজনীয়তা, কম্পাসের সূচীমুখ যে সর্বদাই উত্তরমুখী বা সমুদ্রের অথৈ জলরাশির নীচে যে পাহাড় থাকতে পারে—তার সঠিক ব্যাখ্যা এবং তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে বোধোদয়ে। শিশুমনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তবুও সমুদ্রের জল স্ফীত হয় না কেন? শিশুর জিজ্ঞাসু মনকে তিনি জানান, "কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণ সমুদ্রের জল, সর্বদা কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়।" এভাবে বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টির একটা বৃত্তও তিনি সম্পূর্ণ করে দেন। সমুদ্র ও নদীতে যে বিভিন্ন রকমের মৎস্য, জলজন্তু থাকে তা জানাতে ভোলেননি। তিমি

যেহেতু স্তন্যপায়ী আর চিংড়ি যেহেতু জলজ কীট, তাই তারা কেউই মাছ নয়; এই ধারণাটিও তিনি শিশুদের দেন। বাদ রয়েছে জলস্থ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ প্রাণের কথা। এ বিষয়টি সংযোজিত হলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক জলাধারের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা আমরা পেতাম বোধোদয়ে।

উদ্ভিদ সম্পর্কে লিখেছেন, উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার—লতা, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি। ভূমি ভেদ করে ওঠে বলে তা উদ্ভিদ। উদ্ভিদ যে 'মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উপায়'; অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহের জন্য মানুষ যে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল—এসব কথা বলতে বলতে তিনি আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ধরনের গাছের উপযোগিতা শিশুকে বুঝিয়ে দেন। গাছের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বলছেন— "বড় বড় উদ্ভিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও রয়েছে। এদের ছত্রাক বলে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের অধিকাংশকেই দেখা যায় না। তিনি জানাচ্ছেন, যেখানে প্রচুর ফলের গাছ থাকে তাকে বলে উদ্যান, আর যেখানে ফুলের গাছ থাকে তাকে বলে পুষ্পোদ্যান'। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনিন (ম্যালেরিয়ার ওষুধ) প্রস্তুত হয়; পাট, শন গাছের তন্তু থেকে চট, দড়ি ইত্যাদি; তিসির ছাল থেকে লিনেন ও কেম্ব্রিক বস্ত্রের বয়ন হয়ে থাকে। এরারুট তৈরি হয় হলুদ জাতীয় বৃক্ষের মূল থেকে; আলু, ওল, শালগম ইত্যাদি হলো কন্দ; চা হলো চা গাছের শুষ্ক পাতা উষ্ণ জলে ভিজিয়ে তৈরি করা পানীয়, যার চাষ হয় চীন, জাপান, আসাম, দার্জিলিঙে; গাছের নির্যাস বা আঠা থেকে পাওয়া যায় রবার, ধুনো, তার্পিন তেল, হিং, কর্পূর, গঁদ (Gum); তাল জাতীয় বৃক্ষের 'মজ্জা' থেকে তৈরি হয় সাবুদানা, সংক্ষিপ্ত হলেও নীলগাছ থেকে যে নীল রঙ উৎপন্ন হয় এবং নীল যে বঙ্গদেশে চাষ হয়, তারও উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত এই উদ্ভিজ্জ উপাদানগুলি সবই অর্থকরী ফসল। বিদ্যাসাগর হয়তো চেয়েছিলেন শিশুরা ক্ষুধা নিবৃত্তিকারী ফসলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী ফসলের সঙ্গেও পরিচিত হোক।

'বালক-বালিকাদের' কৃষিকর্ম সম্পর্কে জানাবার আগেই তিনি বলেন— 'ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা সম্মানের কার্য।' এই অধ্যায়ে আমরা এক অন্য বিদ্যাসাগরকে দেখতে পাই। খাদ্য, বস্ত্র সংস্থানে কৃষিকর্মের উপযোগিতা, কোন জমি কোন্ চাষের জন্য শ্রেয়, উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন কি উপায়ে সম্ভব, গাছ লাগানোর সময় কেন উপযুক্ত ফাঁক রাখতে হয় (বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কারের বহু আগেই তিনি তাঁর মতো করে বলেন "জন্তু সকল যেরূপ প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, উদ্ভিদগণ ও সেইরূপ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পারিলে যেমন আমাদের রোগ হয়, তেমনি উদ্ভিদগণেরও অপকার হয়। এজন্য বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না); পর্যাপ্ত সূর্যালোক ; সেচ ও সার; আবর্তিত কৃষি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। ফলন বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক উপলব্ধি করে লেখেন—"বিলাতের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমি অপেক্ষা কোনও ক্রমে উর্বরা নহে; অথচ সার দিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।"

ইতর-জন্তু পর্বে বিভিন্ন গৃহপালিত ও অন্যান্য পশু, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির আলোচনা রয়েছে। গোরু, মোষ, ছাগল, ঘোড়া, হরিণ, চমরীগাই— ইত্যাদি পশুর থেকে আমরা কি কি উপকার পাই; জলের তলায় কিভাবে মুক্তো তৈরি হয়; লাক্ষা বা গালা কোথা থেকে পাই; গুটি পোকা থেকে কিভাবে রেশমবস্ত্র পাওয়া যায়, মৌমাছিরা কখন, কিভাবে, কোথায় মধু জমায়, মৌচাকে যদিও মোম জমা থাকে তবু আমরা যে মোম জ্বালাই তা যে চর্বি তৈরি হয়—এইসব কিছুই ইতর-জন্তু পর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নৈতিকতার শিক্ষাও দিয়েছেন—"সমুদায় চাক (মৌমাছির) ভাঙ্গিলে মধুমক্ষিকারা (মৌমাছি) একেবারে উপায়হীন হয়, এজন্য তাহার কিয়দংশ রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য।" আমরা যদি প্রকৃতির উৎপাদনের কিয়দংশ প্রকৃতির জন্য রেখে বাকিটা ভোগ করতাম তাহলে আমাদের এই বসুন্ধরা অনেক সঙ্কট থেকে রক্ষা পেত।

শিল্প-বাণিজ্য সমাজ অধ্যায়ের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই আসবে ক্রয়-বিক্রয় এবং মুদ্রার কথা। তিনি

জানিয়েছেন মুদ্রা তৈরি হয় টাঁকশালে, যন্ত্রের দ্বারা এবং 'কোন্ রাজার অধিকারে, কোন বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত....এই সমুদায় লিখিত হইয়া থাকে।" তখন কাগজী মুদ্রার প্রচলন খুব বেশি ছিল না। তাই বিদ্যাসাগরের কাছে মুদ্রা হলো 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড"। বোধোদয়ে শিল্প উৎপাদন, তার বাণিজ্যিকিকরণ এবং সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আমাদের দেশের কুটির শিল্প নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইংল্যান্ড, আমেরিকার উন্নতি যে "শিল্পকর্মের" উন্নতির জন্যই তা জানাতে ভোলেননি। তবে শুধু কৃষক, শিল্পী বা বণিকদের দ্বারাই যে আমাদের সব প্রয়োজন মেটে তা নয়, সমাজে ডাক্তার, শিক্ষকদেরও প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের যাবতীয় ক্লেদ যারা পরিষ্কার করেন তাদের কথা না এলেও "বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংগঠিত হয়"— একথা জানিয়েছেন।

বোধোদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পরিশ্রম—অধিকার শীর্ষক আলোচনা। পৃথিবীতে জ্ঞান, অর্থ, কোন কিছুই যে পরিশ্রম বিনা অর্জন করা যায় না, এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে যা অর্জন করে তাতে যে তারই অধিকার—একথা তিনি স্পষ্ট করে দেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক 'বস্তু' যেমন সূর্যের আলো, বৃষ্টি ও নদীর জলে সকলের সমান অধিকার। "এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে, বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

বোধোদয়ের একেবারে শেষে সংযোজিত হয়েছে কিছু 'দুরূহ শব্দের অর্থ'। এটি এবং অন্য আরও একটি বিষয় প্রবন্ধের শেষ দিকে আলোচিত হবে। অধ্যাপক অরুণাভ মিশ্রের কথায় বোধোদয় হলো আপাদমস্তক একটি বিজ্ঞানের বই। বিজ্ঞানের যে যে শাখাগুলি এতে আলোচিত হয়েছে তা হলো— পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, গণিত, শরীর বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, কৃষি বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূগোল এবং তার সঙ্গে শব্দ বিজ্ঞান ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের মতো এতেও রয়েছে কেবলই জ্ঞানের সমাহার। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শিশুমনের উপযোগী করে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু খামতি রয়ে গিয়েছে। বোধোদয়ে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে Popular Science -র প্রয়োগ কতখানি সম্ভব ছিল তাও বিবেচ্য। তবে একেবারে যে অসম্ভব ছিল না তা বোঝা যায় বিহারীলাল সরকারের মন্তব্য থেকে —"এরূপ গ্রন্থের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান শিক্ষা না হইয়া, বিজ্ঞানে যে সকল বিস্ময়ের কথা আছে, যাহাতে শিশুর মন গল্প পাঠের মতো উৎসাহী ও উৎফুল্ল হইতে পারে, সে সকল কথার (ইংরেজীতে যাহা Romance of Science) অবতারণা থাকা ভালো।" বোধোদয়ের আলোচ্য বিষয়গুলি যে শুধু শিশুদেরই তা নয়, বড়দেরও অনুধাবনযোগ্য। বোধোদয়ের অধিকাংশ আলোচনার মূল সুরটি হলো আমাদের এই ভূমণ্ডলের অন্তর্গত সব কিছুর মধ্যেই মানুষ ও প্রকৃতির কার্যকারণ অনুসন্ধান করা। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে, বাস্তুতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। এভাবেই আধুনিক ভাষায় যাকে 'গণবিজ্ঞান' বলে, নৈতিকতার মোড়কে বিদ্যাসাগর তার সূচনা করে যান।

চরিতাবলী গ্রন্থে পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, পণ্ডিত কুড়িজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে তিনজন গণিত, পদার্থ বিদ্যা, শারীরবিদ্যা বিশেষ করে শরীরস্থানবিদ্যা (anatomy)-র সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন 'সিমসন' গণিত ও পদার্থবিদ্যার পণ্ডিত এবং ঐসব বিষয়ে গ্রন্থপ্রণেতা, 'জিরমস্টোন' চিকিৎসক বিশেষ করে anatomy-র পণ্ডিত; লাডন-গণিত, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার পণ্ডিত।

জীবনচরিতে যাঁদের জীবনী সঙ্কলিত হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানসাধক, বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কর্তা, জীবন বৃত্তান্তে এসেছে তাঁদের কঠোর অধ্যবসারের কথা। যেসব মনীষীর কথা এই বইতে রয়েছে তাঁরা হলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, আইজাক নিউটন, উইলিয়াম হর্শেল,

গ্রোশ্যস/হুগো গ্রুট, লিনিয়স, ডুবাল, জেঙ্কিস এবং প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোনস্। সংক্ষিপ্ত আকারে দেখে নেওয়া যেতে পারে বিদ্যাসাগর কিভাবে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে দেখেছেন এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি তাঁদের জীবনী শিশুদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই মহাত্মনরা "দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র" যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করেও যে সৃষ্টিতে অটল ছিলেন তা তিনি দেখিয়েছেন। জীবনচরিত কিন্তু কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার্সের Rudiments of knowledge-র অংশ বিশেষের অনুবাদ। বইটিতে রয়েছে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ পরিভাষার বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ।

কোপার্নিকাসের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— অ্যারিষ্টটল, টলেমি প্রমুখ "পূর্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল পৃথিবী স্থির...চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে....।" বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন, "খৃষ্টীয় ছয়শত বৎসর পূর্বে পিথাগোরাস প্রমুখের ধারণা জন্মে সূর্য স্থির, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং যথা নিয়মে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু অ্যারিষ্টটলীয় মতের বিরুদ্ধে গিয়ে পিথাগোরাসীয় মত প্রতিষ্ঠা সে সময়ে অসম্ভব ছিল। কোপার্নিকাসই প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের কথা প্রকাশ্যে আনেন, যদিও ভিন্ন নামে এই মতটি প্রচলিত হয়। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে "অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ" করার পর পিথাগোরাসের মত অভ্রান্ত বলিয়া কোপার্নিকাসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে এই নতুন প্রণালী বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইল।" কিন্তু নানা ধরনের প্রতিকূলতা আশঙ্কা করে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর ১৫৪৩ খৃঃ প্রকাশিত হয় "On the Revolution of the Heavenly Spheres," তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে।

গ্যালিলিওর জীবন কোপার্নিকাসের মতো নয়। তাঁকে "দুর্বির্ষহ নিগ্রহ" ভোগ করতে হয়েছিল। "পূর্বকাল অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি....পণ্ডিতেরা এইমত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন,....পৃথিবীর আকর্ষণীয় শক্তি আছে। সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বস্তু সকল ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।" যাহার গুরুত্ব (ভার) যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পতিত হয়।" গ্যালিলিও হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখালেন এই সিদ্ধান্ত সত্য নয়। তিনি দেখালেন—"গুরু বস্তু শীঘ্র ও লঘু বস্তু বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, সে সকল বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্বাত (বায়ুশূন্য) স্থানে গুরু ও লঘু বস্তু, যুগপৎ পরিত্যক্ত হইলে, যুগপৎ ভূতলে পতিত হয়।" সনাতন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একথা বলার জন্য তাঁকে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ ও পিসা -দুইই ত্যাগ করতে হলো। পিসা থেকে তিনি এলেন পাডুয়ায়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে 'পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বহু নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত।" বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আর একটি কাজও তিনি শুরু করলেন— তা হলো ল্যাটিনের পরিবর্তে ইটালিয় ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন যা সেকালে "একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।" পাডুয়ায় অবস্থানকালেই তিনি 'দূরবীন' আবিষ্কার করেন যা 'পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক'। জীবনচরিতে গ্যালিলিওর আবিষ্কারের তালিকা এইরকম— উন্নত দূরবীন, সৌরকলঙ্ক, ছায়াপথের গঠন, বৃহস্পতির উপগ্রহ, চাঁদের কলঙ্ক, শুক্রের কলা, শনির বলয়। এবার, আবার তিনি পাডুয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পিসায় ফিরে এলেন। এখানে ধর্মীয়গুরুদের চাপে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি আর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করবেন না। কিন্তু তা আর হলো কই? ১৫৩২ খৃঃ প্রকাশিত হলো 'Dialogue concerning the two chief world system' এই বইয়ের মূল উপপাদ্য কোপার্নিকাসীয় মতের প্রতিষ্ঠা এবং সনাতনী বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ। স্বাভাবিকভাবে, সমগ্র গীর্জা ব্যবস্থা তাঁর বিরুদ্ধে গেল। শুরু হলো 'কুখ্যাত' বিচার। চার্চের মধ্যে, ধর্মযাজকদের সামনে, হাঁটু মুড়ে বসে, বাইবেল ও চার্চের মতকে মান্যতা দিয়ে তাঁকে স্বীকার করতে হলো পৃথিবীর স্থিতিশীলতা এবং

সূর্যের পরিক্রমাকে। এর সঙ্গে একটি অপ্রমাণিত গল্প আছে, যা স্বাভাবিকভাবেই জীবনচরিতে নেই। সেটি হলো— যাজকদের মতকে মান্যতা দেবার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বিড়বিড় করে বললেন— "তবুও ওটা ঘোরে (Yet it moves)"। এহেন বিজ্ঞানীর জীবনী যে জীবনচরিতে ঠাঁই পাবে তাতে আশ্চর্য কি!

গ্যালিলিওর পরে এসেছে নিউটনের জীবনচরিত। তিনি লিখছেন "নিউটন, কেম্ব্রিজ অধ্যয়নকালে, আলোক পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন।" তিনি 'নির্ধারিত করিলেন—আলোক পদার্থ কিরণাত্মক....'। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্কারকে দৃষ্টি বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্র স্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।" আমরা জানি, প্রিজম পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণের ব্যাখ্যাকার নিউটন। তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ (ক) 'বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতা' এবং (খ) 'চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে'—মাধ্যাকর্ষণ, অভিকর্ষ বল, বলবিদ্যা ইত্যাদি তত্ত্ব মানব সভ্যতার বিজ্ঞান চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। "১৬৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি প্রিন্সিপিয়া নামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে।" তিনি আরও লিখেছেন— তিনি 'বুদ্ধিশক্তির' প্রভাবে "গ্রহণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।..... তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" বিদ্যাসাগরের মুগ্ধতা ছিল নিউটনের চরিত্র মাধুর্যে। "নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন" "....এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিমাত্র অভিমান করিতেন না।" এরপর তিনি নিউটনের বিনয়ের সর্বোৎকৃষ্ট উক্তিটি উল্লেখ করেছেন—"আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

উইলিয়াম হার্সেলের জন্ম ১৭৩৮ খৃঃ। ১৭৮১ খৃঃ তিনি ইউরেনাসে গ্রহ এবং পরবর্তীতে ইউরেনাস সর্বাপেক্ষা বড় উপগ্রহ টাইটানিয়া সহ মোট ছ'টি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। যদিও পরবর্তীকালে ইউরেনাসের আবিষ্কৃত উপগ্রহের সংখ্যা দাঁড়ায় ছাব্বিশে। বহু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন। ইউরেনাস ও তার উপগ্রহগুলি আবিষ্কারের পর তিনি অবশিষ্ট জীবন "পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে" ক্রমাগত (উন্নততর) দূরবীক্ষণ" নির্মাণে ও "নভোমণ্ডলী পর্যবেক্ষণেই কাটিয়েছিলেন। হার্সেলের জীবনী লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর চৌদ্দটি বাক্যের একটি অসাধারণ পাদটীকা লিখেছিলেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো যা থেকে বোঝা যাবে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে তিনি কতখানি স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ছিলেন— "সূর্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা (স্থির); আর সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অধুনাতম ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে, সূর্য সকলের কেন্দ্র, গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ।...যাহারা কোনও গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে।...এক সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌরজগৎ হয়। ....গ্রহ, উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্যের আলোকপাত দ্বারা এরূপ প্রতীয়মান হয়। এই ...বিশ্ব মধ্যে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।" আমাদের এই সৌরজগতের বাইরে আরও যে সৌরজগত থাকতে পারে, তার ইঙ্গিত তিনি দিয়ে রেখেছেন।

হার্শেলের পরে আলোচনায় এসেছেন গ্রোশ্যস—হুটো গ্রুট নামে যিনি সমধিক পরিচিত। গ্রুট "বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।" তবে তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর লিখিত গ্রন্থের জন্য, যা পরবর্তীকালে লক্ প্রমুখকে প্রভাবিত করেছিল। লিনিয়াস

ছিলেন একাদিক্রমে পদার্থবিদ্, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ্। 'Philosophica Botanica' তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনিই প্রথম শুরু করেন উদ্ভিদের দ্বিপদনামকরণ (Binomial Nomenclature)।

এরপর এসেছেন বলটিন (ভ্যালেন্টিন) জামিরে ডুবাল (Duval) বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্রের একনিষ্ঠ পণ্ডিত। আলোচনায় এসেছেন ল্যাটিন, গ্রীক ও গণিতের পণ্ডিত টমাস জেনকিনস্ ও প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোনস্। জীবনচরিতের একেবারে শেষে সংযোজিত হয়েছে "দুরূহ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ," যা পরে আলোচনা করা যাবে।

বর্ণপরিচয়—বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু পাঠ্যপুস্তক এটি। বর্ণপরিচয়ে আমরা দেখব কিভাবে পঞ্চাশটি বর্ণকে ঝাড়াই বাছাই করে, উপযোগিতা এবং যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তিনি বাংলা বর্ণমালাকে সাজিয়ে দিয়েছেন; এভাবে তিনি হয়ে ওঠেন একজন ভাষাবিজ্ঞানীও। বর্ণপরিচয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—বহুকাল ধরে বাংলা বর্ণমালায় ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ, মোট ৫০টি বর্ণ ছিল। যেহেতু দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ-৯ কারের কোন প্রয়োগ বাংলাভাষায় নেই তাই তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। ং এবং ঃ কে স্বরবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণে ঠাঁই দিয়েছেন, আর ৺কে ব্যঞ্জনবর্ণে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে গণ্য করেছেন। ড, ঢ, য এবং ড়,ঢ়,য়-কে স্বতন্ত্র বর্ণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ক এবং ষ মিলিয়ে ক্ষ। সুতরাং এটি সংযুক্ত বর্ণ। তাই একে ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বর্জন করেছেন। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল ও জুন মাসে দুটি খণ্ডে বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়। সেই থেকে আজও অবধি বাংলা বর্ণ শেখার ক্ষেত্রে ৯ ছাড়া আর কোন বর্ণের সংযোজন বিয়োজন হয়নি। বর্ণ পরিচয় কেবল বর্ণশিক্ষার বই নয়, বিদ্যাসাগরের অন্য শিশু পাঠ্যের মতো এটিও নীতিকথায় ভারাক্রান্ত। তবু একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে বর্ণপরিচয়ে তিনি শিশুদের চারপাশের পরিবেশও দেখতে শেখান। যেমন প্রথম ভাগের ৮ম পাঠে রয়েছে—"কাক ডাকিতেছে, পাখি উড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, গরু চরিতেছে, জল পড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে।" ছোট ছোট বাক্য শেখার সাথে সাথে শিশুরা তার চারপাশের পরিবেশটাও দেখতে পাচ্ছে। সাধারণ কিছু স্বাস্থ্যবিধিও তিনি শেখাচ্ছেন। যেমন—"রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না" বা গোপাল বিদ্যালয় থেকে এসে কাপড় ছেড়ে, হাত, পা, মুখ ধুয়ে তারপর খেতে বসে। দ্বিতীয় ভাগের নবম পাঠে শেখাচ্ছেন "....পাখী বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেলা মারিও না।" এই প্রসঙ্গে "নীতিবোধ" এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত নীতিবোধের প্রথম পরিচ্ছেদের শীর্ষক হলো 'পশুগণের প্রতি ব্যবহার'। পশুরা 'মানবজাতির কখন কোন অপকার করে না।" অতএব কোন প্রাণীকে ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম। শিশুশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা অবশ্যই একটি আধুনিক ধারণা। 'ভূগোল-খগোল বর্ণনম্, শিশুপাঠ্য নয়, বা পাঠ্যবইও নয়। বইটির প্রকাশ ১৮৯২ সালে, তাঁর মৃত্যুর পরে। বিষয়বস্তু ভূগোল আর জ্যোতির্বিদ্যা। খগোল হলো ভূমণ্ডল— যার গায়ে আমরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র দেখতে পাই। এই শ্লোকগুলি রচিত হয়েছিল জনৈক ইংরেজ জন মিরর ঘোষিত পুরস্কার লাভের জন্য। বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসায় জ্যোতির্বিদ্যায় যে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ ছিল এই বইটি তার প্রমাণ।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের কাজকর্মের মধ্যে আমরা তাঁর বিজ্ঞানমনন, যুক্তিবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ছাপ দেখতে পাই। অধ্যক্ষ হিসেবে সংস্কৃত কলেজে তিনি যোগ দেন ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে। পরের বছর এপ্রিলে সংস্কৃত কলেজের 'প্রকৃত উন্নতি'-র জন্য "Notes on Sanskrit College" শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ খসড়া তৈরি করেন। ২৬ প্যারার এই নোটটিকে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার আকর বলা যায়। এই নোটের কিছু অংশ উল্লেখ করলে বোঝা যাবে পাঠ্যসূচীকে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তোলা যায়। নোটটির কিছু অংশ এইরকম (ক) 'বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হলো (সংস্কৃত কলেজে) লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিত বিজ্ঞানের পক্ষে এই দু'খানি বই যথেষ্ট নয়। ....এমন এক পদ্ধতিতে বই দু'খানি রচিত,

.... যে আসল বিষয়বস্তু এক একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। (খ) সংস্কৃতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। (গ)....সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখিতে পারবে। (ঘ) "....সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজীতে পড়াতে হবে....। (ঙ) ...বর্তমান শিক্ষকরা গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নন।....সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোন কাজ হবে না।

অধ্যক্ষ হিসেবে সংস্কৃত কলেজে বেশ কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন। যেমন, প্রথমে কায়স্থদের জন্যও কিছুকাল পরে অন্যান্য বর্ণের জন্যও সংস্কৃত কলেজকে উন্মুক্ত করা হলো; অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে রবিবার ছুটির দিন ঘোষিত হলো, এডমিশন ফি এবং মাসিক বেতন ধার্য করা হলো। এইসব পরিবর্তনের পাশাপাশি পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকেও তিনি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর "Notes on Sanskrit College" এ বিধৃত রয়েছে। সংস্কৃত কলেজের এই দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখলেন না। আপত্তি জানানো হলো, তবে ঘুরপথে। বেনারসের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জেমস্ আর ব্যালেন্টাইন। তাঁকে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে বাংলার শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হলো। যথাসময়ে, ব্যালেন্টাইন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করলেন এবং কলেজের পাঠ্যসূচীতেও কোন পরিবর্তন ঘটালেন না। পরিবর্তে, শিক্ষা পরিষদের অধিকর্তা F. J. Mouat কে ৭ই সেপ্টেম্বর এবং ৫ই অক্টোবর, ১৮৫৩ তে দুটি পত্র লেখেন। এই পত্র দুটি থেকে তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা, যুক্তিবাদীতা, দৃঢ়চিত্ততা, সর্বোপরি আমাদের এই সমাজকে যে তিনি হাড়ে হাড়ে চিনতেন তা বোঝা যাবে। (ক) 'কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়।....কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই।" ব্যালেটাইনের আশঙ্কা ছিল সংস্কৃত কলেজের চালু পাঠক্রম অনুসরণ করলে ছাত্রদের কাছে "সত্য দ্বিবিধ" এরূপ ধারণা জন্মাবে। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর জানান (খ) "যে ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি এই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য ...পাঠ করেছে...বুঝতে চেষ্টা করেছে তার কাছে সত্য সত্যই।" আমাদের অনড় সমাজকে তিনি যে সম্যক চিনতেন তা বোঝা যাবে। (গ) "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়!....প্রগতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সমাদর যোগ্য করা রীতিমতো কঠিন। তাঁদের কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ় মূল। সেগুলি নির্মূল করা সহজ ব্যাপার নয়।....পুরনো সংস্কার তাঁরা অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরে থাকবেন।" বিদ্যাসাগরের এই ভাবনার খুব অন্যথা আজও ঘটেনি। সমাজকে তিনি যেভাবে চিনতেন। (ঘ) "শাস্ত্রে যার বীজ আছে, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাকে, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন, যেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে। বিজ্ঞানের জয় হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে, সমাজের এই অন্ধকার গর্তগুলির স্বরূপ তিনি কত সহজে বুঝতে পেরেছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি কোন আপসে রাজী ছিলেন না। তাঁর এই বোধ, এই মননের জন্য, এতো এতো বছর পরেও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক।

জীবনচরিতে যেহেতু বহু বিজ্ঞানীর জীবন আলোচিত হয়েছে, তা অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষার অভাব তিনি অনুভব করেছেন, "বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম" তবু তিনি "তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ' সঙ্কলন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তবে সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিদ্যাসাগর কৃত কিছু বৈজ্ঞানিক

পরিভাষা তুলে ধরলে দেখা যাবে তাঁর আশঙ্কা অমূলক ছিল। তাঁর কৃত পরিভাষাগুলি আজও 'বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত'। পরিভাষাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এই রকম— (1) Arithmatics - পাটিগণিত, (2) Axis - মেরুদণ্ড ("ভূগোলের অন্তর্গত উভয় কেন্দ্রভেদী কাল্পনিক সরলরেখা"), (3) Astronomy - জ্যোতির্বিদ্যা, (4) Astrology- নক্ষত্রবিদ্যা, (5) Botany - উদ্ভিদবিদ্যা, (6) Centre -কেন্দ্র, (7) Coast-উপকূল, (8) Degree -অংশ, অক্ষাংশ, (9) Discovery - আবিষ্ক্রিয়া, (10) Equator-বিষুবরেখা, (11) Elasticity -স্থিতিস্থাপক, (12) Heavenly Bodies -জ্যোতিষ্ক, গ্রহণক্ষত্রাদি, (13) Index - শঙ্কু, (14) Mathematics -গণিত, (15) Milky way-ছায়াপথ, (16) Minerology-ধাতুবিদ্যা, (17) Nabulac -নীহারিকা, (18) Natural Philosophy - পদার্থবিদ্যা, (19) Nature -প্রকৃতি, (20) Natural History- প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, (21) Optics - দৃষ্টিবিজ্ঞান, (22) Orbit কক্ষ, গ্রহগণের পরিভ্রমণ পথ, (23) Observation -পর্যবেক্ষণ, (24) Pure Mathematics -বিশুদ্ধ গণিত, (25) Research -গবেষণা (26) Science -বিজ্ঞান, (27) Satelite -উপগ্রহ, (28) Tide -জলোচ্ছ্বাস (29) Telescope -দূর-বীক্ষণ ইত্যাদি।

সরাসরি বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কিছু শব্দেরও বাংলা পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। তার কয়েকটি এরকম — (1) Colonial- ঔপনিবেশিক, (2) Stocking - মোজা, (3) Biographer-চরিতাখ্যায়ক, (4) Monument-কীর্তিস্তম্ভ, (5) Perspective -পরিপ্রেক্ষিত, (6) Inn - পান্থনিবাস, (7) Genius-প্রতিভা, (8) University-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এছাড়া, বোধোদয়ের শেষে কতগুলি 'দুরূহ' শব্দের অর্থ সংযোজন করেছেন। যেমন— (1) অনুবীক্ষণ-চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়; (2) মস্তিষ্ক—মস্তকের ভিতর ঘৃতের মতো যে কোমল বস্তু থাকে, ইদানীন্তন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন। (3) মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। সঙ্গে জানিয়েছেন—এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজন্য তথায় দ্রব্য জমিয়া যায়। (4) স্নায়ু—সর্বশরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে। এইজন্য কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে", ইত্যাদি।

শুধু পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যসূচীতে নয়, বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান মননকে আমরা খুঁজে পাব তাঁর জীবনচর্যাতেও। ১৮৭- সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 'Indian Assoiciation for the cultivation of Science' স্থাপনে উদ্যোগী হন, তখন বিদ্যাসাগর, বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দেবার জন্য এইরকম একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগে সোৎসাহে যোগ দেন; নগদ এক হাজার টাকা দান করেন। বিদ্যাসাগরের আর একটি পছন্দের জায়গা ছিল হোমিওপ্যাথি। এলোপ্যাথ চিকিৎসার ব্যয়বহুলতা এবং হোমিওপ্যাথের কার্যকারিতা তাকে হোমিও চিকিৎসার অনুগামী করে তুলেছিল। ১৮৬০ সালে উত্তর পাড়া থেকে ফেরার পথে গাড়ী দুর্ঘটনায় আহত হবার পর তিনি বহুদিন হোমিও চিকিৎসা করিয়েছিলেন এবং নিজে ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছে হোমিও চিকিৎসা প্রণালী শিখেছিলেন। জীবনের শেষ দিকে কার্মাটাঁড়ে অবস্থানকালে সেখানের জনজাতি মানুষদের হোমিও ওষুধ দিয়ে চিকিৎসাও করতেন। হাঁপানির হোমিওপ্যাথ ওষুধ আবিষ্কারের পেছনে তাঁর অবদান রয়েছে বলেও মনে করা হয়। এলোপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যে তাঁর যুক্তির কাছে নত হয়েই এলোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এসেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। বীরসিংহেও তিনি একটি হোমিও চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর উইলে ঐ চিকিৎসালয়ের জন্য ৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের আজীবনের সুহৃদ ছিলেন ফার্স্টবুক প্রণেতা প্যারীচরণ সরকার। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে সমকালীন কয়েকজন বিজ্ঞানপথিক, প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এঁদের মধ্যে ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন হোমিও চিকিৎসক, Indian Association of Cultivation of Science-র প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল

সরকার, এছাড়াও আরও বহু তৎকালীন চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বাংলা ভাষায় প্রথম পাটিগণিত (১৮৪৬) ও বীজগণিত (১৮৫১) গ্রন্থের রচয়িতা প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী যে বিদ্যাসাগরের উৎসাহেই উজ্জীবিত হয়েছিলেন তা জানিয়েছেন। তবে, সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল অক্ষয় কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে "হিরণ্ময় বন্ধুত্ব"। ব্যক্তিজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ, অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মেছিলেন ১৮২০ সালে। সে হিসেবে এ বছরে তাঁরও জন্ম দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হলো। 'চারুপাঠ', 'পদার্থবিদ্যা', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। এছাড়া তাঁর অন্যতম রচনা হলো— 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি। এছাড়া তিনি নশোর বেশি পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। সমকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'নাস্তিক' এবং পরবর্তীকালে তাঁর লেখালেখি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা বিশ্লেষণের পর তিনি 'অজ্ঞেয়বাদী' (agonistic) অভিধায় ভূষিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তিনি সম্পাদক এবং তাঁর উদ্যোগে বিদ্যাসাগর ঐ পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষমণ্ডলীর (পেপার কমিটি) সদস্য। এই কমিটিই স্থির করতো প্রকাশিতব্য বিষয়সমূহ। অক্লান্ত বিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানসেবক অক্ষয়কুমারের বহু রচনা যে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বিদ্যাসাগরের যে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল তা বলাই বাহুল্য। এমন কি, ব্রাহ্মধর্মী দেবেন্দ্রনাথের পত্রিকায় বেদের অভ্রান্ততাকে চ্যালেঞ্জ করে অক্ষয়কুমার একটি ফর্মূলাও ছেপেছিলেন—বীজগাণিতীয় ঢঙে সেই ফর্মূলাটি হলো "পরিশ্রম = শস্য; প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য; অতএব প্রার্থনা = O" পেপার কমিটির অন্যতম সদস্য বিদ্যাসাগরের সম্মতি ছাড়া এটি যে ছাপা যেত না, বলাই বাহুল্য। আবার, বিধবা বিবাহ আন্দোলন সূত্রে, বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকাটিও ছেপেছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে পত্রিকাটি দৃঢ়ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের অগ্রদূত হলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। সুহৃদ হিসেবে, বন্ধু হিসেবে তাঁর প্রভাব যে বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান মননে পড়বে তা বলাই বাহুল্য।

এই লেখাটি শেষ হবে যে আলোচনাটি দিয়ে তা হলো ঈশ্বরচন্দ্র কি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনন আলোচনায় এই প্রসঙ্গটি না তুললেও হোতো। তোলার কারণ বোধোদয়ে 'ঈশ্বর' সম্পর্কিত একটি স্তবকের উপস্থিতি। 'ঈশ্বর' শীর্ষক স্তবকে লিখেছেন—"ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন; কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ...."। বোধোদয় আপাদ মস্তক একটি বিজ্ঞানের বই। বইটির সূচনা হয়েছে পদার্থের স্বরূপ আলোচনা দিয়ে—সেখানে এই স্তবকটির কি কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল? বইটির প্রথম সংস্করণে এই স্তবকটি ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয় এবং নবম সংস্করণে বিযুক্ত হয়। সমকালেই বোধোদয় সম্পর্কে অ-ধার্মিকতার অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন এক পাদ্রী জন মার্ডক বোধোদয়কে "চূড়ান্ত বস্তুবাদী" বলে আখ্যা দেন। বিদ্যাসাগর যে ইন্দ্রিয় নির্ভর জ্ঞানের কথা বলেছেন, কোনও ঈশ্বরের আদশে বা ধর্মোপদেশকে জ্ঞানের উৎস বলেননি, তাতেও মার্ডকের উষ্ম জন্মেছিল। সুখের কথা, শহরের অন্যান্য পাদ্রীরা বা বিভিন্ন মিশনারী স্কুলগুলি মার্ডকের এই মন্তব্যকে গ্রাহ্য করেননি। স্কুল নির্বিশেষে বর্ণপরিচয় এবং বোধোদয় অত্যন্ত জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক ছিল। শুধু মার্ডক নন, বহু হিন্দু ও বোধোদয়ের বিরোধী ছিলেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন— "বোধোদয় হিন্দু সন্তানের পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা।" তবে, কোনো ধর্মধ্বজাধারীরাই যে তাঁর মেরুদণ্ড নত করতে পারেনি তা নিশ্চিত। মনে হয় শিশুরা পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশ থেকে যে ঈশ্বর বিশ্বাস শিখবে তার পরিবর্তে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে শিশুদের একটি নৈর্ব্যক্তিক ধারণা দিতে চেয়েছিলেন। এজন্যই তিনি বলেন— 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।'

ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর ভাবনার স্থানটি কেমন ছিল? বিদ্যাসাগর ইহলোকে বিশ্বাস করতেন,

পরলোকে নয়। এজন্য তাঁকে 'নাস্তিক' বলা সঙ্গত নয়। আবার "নিতান্ত লোকাচারের দাস" হয়ে তিনি সারাজীবন চিঠির শিরোনামে 'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্' লিখেছেন বলেও মনে হয় না। বিহারীলাল সরকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইহা বিশ্বাস, কি অভ্যাসের ফল, ঠিক করিয়া তাহা বলিবার উপায় নাই।" তিনি যে কারণে চটিজুতা পায়ে দিতেন। থান-ধুতি-মোটা চাদর পরিতেন, ভট্টাচার্যের মতন মাথা কামাইতেন, সেই কারণেই পত্রের শিরোভাগে ঐরূপ লিখিতেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি কোন ধর্মগুরুর কাছে দীক্ষা নেননি। যত মনীষীর জীবনী রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে একজনও ধর্মগুরু নয়। কোনদিন কোনো মন্দিরে গিয়েছেন বলে জানা যায়নি। বিদ্যাসাগরই কাশীতে বসে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন তাঁর পিতা-মাতাই অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর; বিশ্বনাথ দর্শনে কাজ নেই। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 'দুনিয়ার মালিকের' অসহায়তা নিয়ে বিদ্রূপও করেছেন। একবার এক জাহাজ ডুবিতে প্রায় ছ'সাতশো লোক মারা গিয়েছিল। ব্যথিত বিদ্যাসাগর বলেছিলেন —'পরম করুণাময় হয়ে...., কেমন করে তিনি একসঙ্গে ডুবিয়ে মারতে পারলেন সাতশ-আটশ মানুষ? "ঈশ্বর নিরাকার এবং চৈতন্যস্বরূপ এই নৈর্ব্যক্তিক ধারণাই যে ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর ধারণা সে বিষয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— 'বোধোদয়ের মতই তাঁহার ধর্মমত"।

পরিশেষে গোপাল হালদার মহাশয়ের কথা দিয়ে শেষ করবো। "এদেশে ধর্ম বলতে যা বোঝায় এবং ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর বলতে যা বোঝেন— বিদ্যাসাগর তাতে আস্থা রাখতেন না, তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবিক ধর্মে....। তাঁর সারা জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বিষমরূপেই চিড় খেয়ে গিয়েছিল....। তথাপি ঈশ্বর সেই শূন্যস্থান...জুড়ে বসতে পারেননি, তিনিও ঈশ্বরের আশ্রয় খোঁজেননি।" ধর্মনিরপেক্ষ জীবনযাত্রা, বস্তুমুখী জীবনদর্শন এবং যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা-বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষে আমরা যদি তাঁকে এভাবে স্মরণ করি তাহলে আমরা হয়ে উঠবো "উপযুক্ত মানুষ"; পূর্ণ হবে আমাদের বোধোদয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ঃ প্রধান সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার, প.ব. নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭২

২) প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ঃ বিমান বসু (স) —বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, ১৯৯১

৩) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ঃ বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩

৪) সংবর্তক ঃ দ্বিজন্মশতবর্ষ বিদ্যাসাগর বিশেষ সংখ্যা, সৌরভরঞ্জন ঘোষ, ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—জানুয়ারী ২০২০

৫) কোরক— শারদ সংখ্যা, ২০১৯, তাপস ভৌমিক (স.)

৬) বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান ভাবনা-অরুণাভ মিশ্র, পত্রলেখা, ২০২০

ঊনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

তপতী ভট্টাচার্য
কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ
সরকারি মহাবিদ্যালয়, খুমুলুঙ

নবজাগরণ বা রেনেসাঁস (Renaissance) হল জাগৃতি বা নবজাগরণ। নবজাগরণ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বহুদিনের প্রস্তুতির ফসল। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। তাদের নিজস্ব জীবন-পদ্ধতি বলে কিছুই ছিল না। চার্চ তাদের স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। এই সময়ে নবজাগরণ দেখা দিল। দীর্ঘ মধ্যযুগীয় নিদ্রা থেকে জেগে উঠে জীবন ও জগৎকে নতুন চেতনার আলোকে নতুন করে আবিষ্কার করা।

বহুকালব্যাপী তমোনিদ্রায় অভিভূত ভারতবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দ নেত্রোন্মিলীত করে, দেশ বিদেশের জাগতিক উন্নতির গৌরবোজ্জ্বল দিবালোকের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য অমোঘ আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জাতীয় জীবনের এমন একটা সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে বাংলা দেশের নবজাগরণ সর্বক্ষেত্রে এক গভীর ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের বাণী বহন করে এনেছিল। এই নবজাগরণ কোন এক ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় এসেছিল, একথা বলা যায় না। কোন একটি ঘটনা বা কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ বা কোন একটি ব্যক্তিকে নবজাগরণের কারণ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলে তা ভুল হবে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে নানা ঘটনাপ্রবাহ, বিভিন্ন চিন্তাধারায় এবং দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের কিছু ব্যক্তির চেষ্টায় বাঙালী ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। বহুদিনের জড়তা, প্রগতিশীল চিন্তাবিমুখতা, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা, কুসংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে মানবিকতা, যুক্তিবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদের মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, ধর্মের ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের প্রচলন, নতুন চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে গদ্য ভাষার প্রবর্তন, উপন্যাস, গীতি কবিতার শুরু, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন প্রভৃতির মধ্যে নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি আরও অনেকের মধ্য দিয়ে নবজাগরণ মূর্ত হয়ে উঠল।

ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগকে বলা হয় তমসাচ্ছন্ন যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ চেতনা, রাজনীতি-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সংকীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে নানা ঘটনা প্রবাহ, বিভিন্ন চিন্তাধারার এবং উপরে উল্লিখিত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের কিছু ব্যক্তির চেষ্টায় বাঙালী ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে এই পরশাসিত পতিত জাতির অধঃপতনের চরম অবস্থায়, সন্ন্যাসের মহাবীর্যকে আশ্রয় করে এক মহাপুরুষ ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমষ্টি মুক্তির মহান আদর্শ প্রচার করে — যা নবজাগরণের পথকে আরো সুগম করে তোলে।

রক্ষণশীলতা, জাতিভেদের অত্যাচার, ভারতবাসীর দারিদ্র, হতাশা অথচ আত্মসম্মানবোধ, ধর্মের ছদ্মবেশে কুসংস্কার, সকল কিছুই বিবেকানন্দকে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। তিনি উপলব্ধি করেন, শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। বিবেকানন্দ দার্শনিক বিমূর্ত চিন্তা ও ধর্মীয় তাত্ত্বিক বিচারের সঙ্গে দেশবাসীর বাস্তব সমস্যাকে মিলিত করে তাঁর চিন্তাধারা গঠন করেন। নবভারতের অন্যতম রূপকার এই বিবেকানন্দ।

Burchardt (বুরশার্ত) এর মতে, মধ্যযুগের ইউরোপের অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারের অচলায়তন থেকে ইউরোপবাসীর চিন্তা ও মননশীলতার মুক্তি ছিল পঞ্চদশ শতকের নবজাগরণের প্রাণশক্তি। নবজাগরণের মূল লক্ষণ ছিল অনুসন্ধানী, যুক্তিবাদী, প্রশ্নকারী, আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গীর জাগরণ।

ভারতের মধ্যযুগের আত্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ মুক্তির পথ দেখায়।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সব কিছু সমস্যার সমাধান উপযুক্ত শিক্ষার ভেতর দিয়ে হতে পারে। তাই তিনি বলেন প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান প্রস্তরখণ্ডে সুপ্ত অগ্নির মত আছে, তাকে বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করা। "Like fire in the piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which bring it out."

তিনি বলেন, "No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself"। বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতবাসীর জন্য গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "A nation is advanced in proportion as education and intelligence spread among the masses."। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মানবতাবাদী, দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী, নির্ভীক, জ্বলন্ত দেশপ্রেমিক, তেজস্বী, শ্রদ্ধাবান ইত্যাদি নানা বিশেষণের অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকালের পরিসীমা মাত্র চল্লিশ বছর।

ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি উপলব্ধি করেন, দুর্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে জাগ্রত করতে হলে একদিকে তাকে কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে হবে, অন্যদিকে তার অধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। তাঁর জীবন দর্শনের সারকথা জীবে সেবা এবং আত্মার মুক্তি। তিনি বলেন, "Education is the manifestation of perfection already in man."।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তি পান। তিনি একই সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তি ও দর্শনও পড়েন। বিভিন্ন দার্শনিক যেমন হিউমের, মিলের কান্টের, হারবার্ট স্পেনসার এর, ডারউইন এর লেখা দর্শন পড়েন এবং উদ্বুদ্ধ হন ও সমৃদ্ধ হন।

স্বামীজির মতে মানুষের সম্ভাবনার পরম প্রকাশ ঘটে যখন মানুষ আত্মশক্তিকে, সাক্ষাৎ অনুভব করে এবং উপলব্ধি করে আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করে। তাঁর কথায় "Complete continence gives great intellectual and spiritual power." ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে স্বামীজি আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মীয় মহাসভায় বক্তৃতা দেন। তাঁর এই আকর্ষণীয় বক্তৃতা ও দার্শনিক চিন্তাধারা সমস্ত যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যা নাকি ১৯ শতকের নবজাগরণকে এক সুউচ্চ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল।

বিবেকানন্দের দর্শনতত্ত্ব ও ভাবাদর্শ সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বেদান্ত দর্শনই মানুষকে জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে যেখানে মানুষ

ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। তিনি বলেছেন মানুষের সেবাই হল ঈশ্বরসেবা। Swami Vivekananda was at the world's fair to promote the Hindu Philosophy of Vedanta and Yoga, which was taught to him by the living Hindu saint; Ramkrishna.

বিবেকানন্দ ১৯ শতকের নবজাগরণের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলা যায়। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত যুব সমাজ অগ্রদূতের ভূমিকা নেয় নবজাগরণে। তিনি বলেছেন 'চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি এবং কল্যাণ।' তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out."

বিবেকানন্দের অবদান আমরা দেখতে পাই তাঁর তৈরি রামকৃষ্ণ মিশন, বেদান্ত সমাজ, অদ্বৈত আশ্রম এগুলিতে। তিনি ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক। তিনি বলেন, "The poor, the downtodden, the ignorant, let these be your God." তিনি বলেছিলেন, "Arise, awake and stop not till the goal is reached." এইভাবে তিনি তাঁর দর্শন সমস্ত মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। আর তার ফলশ্রুতিই আমরা দেখতে পাই নবজাগরণে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "Expansion is the sigh of life and we must spread the world over with our spiritual ideals." বিবেকানন্দ আরো বলেছিলেন, "Life is ever expanding, contraction is death."

নবজাগরণ হচ্ছে ব্যক্তি চেতনার জাগরণ। আর এই জাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতকে সাহিত্য, শিল্প, মননশীলতা, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে ভারতে নবজাগরণ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে ভারতের আত্মিক অগ্রগতি এবং ভারতের নবজাগরণের কথা ভাবা শিবহীন যজ্ঞের মতই অসম্পূর্ণ।

Reference :

১) Vivekananda A Biography -- Swami Nikhilananda.
২) স্বামী বিবেকানন্দ, নতুন তথ্য নতুন আলো— শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৩) Service and Spirituality — অসিতচন্দ্র চক্রবর্তী।
৪) মানবতার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ— সুপ্রীতি ভট্টাচার্য।
৫) ভারত ইতিহাসে পরিক্রমা— অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি।

রিপোর্টার

ডঃ মহুয়া আচার্য
অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা
এম.বি.বি. কলেজ

অমল পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে।

ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে, কোথা থেকে শুরু করলে শোভন অশোভন এর বিভেদ মাত্রা অতিক্রম হয় না, বুঝতে পারছে না। মায়ের একই কথা, অমল চলে আয় বাবা।

কিন্তু সে ফিরতে চায় না।

হারতে চায় না, টিকে থাকতে চায়।

নদী তীরবর্তী মুখর জনপদ আজ নিঝুম। থৈ থৈ জল, বিশাল বিশাল ঢেউ এর আঁচড় আর কামড়ের ক্ষত গায়ে নিয়ে সে দাঁড়ানো। আঘাতে আঘাতে ক্লিষ্ট আর নিঝুম তাই এ জনপদ।

উজ্জ্বল সব ছেলেমেয়ে আধুনিক অত্যাধুনিক ক্যামেরা, শব্দ সংগ্রহ করার যন্ত্র নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের মাইক্রোফোনের গায়ে তাদের চ্যানেল এর নাম নানা রঙ এ জ্বল জ্বল করছে। স্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য ভেঙ্গে দিচ্ছে যান্ত্রিক তাদের আধুনিক কণ্ঠ। সমস্ত পাঠ্য বই ভেসে যাওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেয়েটির সামনে নির্বিকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন রাখছে তাদেরই কেউ, এই যে পরীক্ষার আগে তোমার বই খাতা ভেসে গেল তোমার কেমন লাগছে?

মেয়েটির মুখের সামনে টিভি চ্যানেলের ছাপ দেওয়া এক গাদা মাইক্রোফোনের ভীড়।

ওদের প্রাণটা বেঁচে আছে। কারো গোয়াল ভেসে গেছে, কারো বাগান, ঘর, গোলা এবং ধান।

তবু সব্বাই জানতে চায় এই প্লাবন, এই জলোচ্ছ্বাস, এই ভেসে যাওয়া দুর্যোগ, হারানো, এই আতঙ্ক এইসব মিলিয়ে নবলব্ধ পরিস্থিতিতে মানুষগুলো কেমন আছে? সদ্য স্বজনহারা, মৃত সন্তানের মা, এদের নিজের আত্মা নিঃসৃত হাহাকার, তাদের নিজেদের মুখে না শুনলে দর্শককুল হৃষ্ট হন না। প্রকৃতই প্রকৃত অসহায় কি? কখনো কখনো চোখের ভাষাই কি যথেষ্ট নয়?

কারা জানতে চায়? কেন জানতে চায় এতো অনুপুঙ্খ অন্যের দুঃখের সাতকাহন?

যারা দেখবে, জানবে, শুনবে, তারা কি বাড়া ভাতের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে? তাদের কি মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হবে? যদি সত্যি এমন কেউ থাকেন তাদের কি অবলীলায় অবাস্তববাদী দুঃখ বিলাসী বলে অন্যেরা নস্যাৎ করে দেবে না?

তবে কেন এই নৈর্ব্যক্তিক দুঃখ বিপণন?

অমল তাই পারছে না কাল উপযোগী এবং সময়ানুপাতিকভাবে উপস্থাপিত হতে।

মার পিছু ডাক তো আছেই, এসব তুই পারবি না, অমল চলে আয় বাবা।

অমল তাই পিছিয়েই পড়ছে।

শুকনোখালির ইট ভাটাতে সেবার একমাত্র মা থাকা সেই কুলি মেয়েটিকে আঁচড়ে কামড়ে গেছিল কারা। অমল চেয়েছিল দোষীর শাস্তি হোক, শাস্তি হোক। সে তখন এই টিভি চ্যানেলএ নুতন যোগ দিয়েছে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। ওই গ্রামে সে ঢুকতেই পারে নি। সে খুব চাইছিল কিছু একটা হোক। নারী হিসেবে, মানুষ হিসেবে চরমতম অবমাননা নিয়ে মেয়েটি চলে গেল। এমনকি কেউ আশ্চর্যও হলো এমন মেয়েতে

যেতে কিভাবে রুচি হয়? কিন্তু দোষীর কোনো শাস্তি হলো না। না একটা মোমবাতি, না একটা মিছিল, না কোন প্রকাশ্য জনমত, কিছু হল না। মহিলা বিষয়ক সমস্যা দেখার সংগঠনগুলো ও নিজেদের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ব্যতিরেকে কোন শব্দ খরচ করেন নি। অমলের চ্যানেল ও চাইছিল না এ নিয়ে জল ঘাটতে। কোনও একটা চ্যানেল ওই ভুলুণ্ঠিত অর্ধদগ্ধ মেয়ের ছবি নিয়েছিল। তিন চার লাইন খবরের সাথে দুদিন ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েওছিল। মৃত মেয়েটির মাকে তার তাৎক্ষণিক অনুভূতি ও আনুসঙ্গিক কিছু জানতে চেয়ে প্রশ্নও করেছিল। কিন্তু এখানেই শেষ। মৃত মেয়ের মা তার শোকের এত উচ্চস্তরীয় সহমর্মী দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল।

অমলের চ্যানেল তাকে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেয়নি। এমন কালো কুশ্রী মেয়ে, হোক না সে যত বড় অমানবিকতার শিকার, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মুখ দেখতে কে চাইবে? বলবে, একই খবর বড় চটকায়।

অমল তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কতদিন। মানসিকভাবে এত পরাজিত, বিমথিত সে আগে কোনদিন অনুভব করেনি। নিজের পছন্দে সে সাংবাদিকতা পড়েছে। কোনো পারিবারিক চাপ তার নেই। তার মা ভারত সঞ্চার নিগমের উচ্চ আধিকারিক, বাবার স্বাধীন আইন ব্যবসা। বোন পড়ছে।

তার মল্লিকাও অত্যন্ত সাহসী মেয়ে। অমলের চাকুরীর মুখ চেয়ে সে বসে নেই। যবে দু'জনে চাইবে, তারা একসাথে মিলে ঘর করবে। মল্লিকারা এখন অন্যরকম। তারা আত্মবিশ্বাসী, অনাড়ম্বর এবং স্বাবলম্বী।

তবু অমল কাজ ছেড়ে যায়নি। লেগে আছে। কাজের জন্য যেখানেই যাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যিক। পাশ করে যেখানেই চাকুরীর কোন প্রথাগত সাক্ষাৎকারে গেছে, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে হতেই হয়েছে। এ কাজে অভিজ্ঞতার অনেক দাম। অমল তাই মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

অগ্নি, তাদের চ্যানেলের নবাগত ক্যামেরা ম্যান। অগ্নির ক্যামেরা কথা বলে। তার ক্যামেরা এতো বেশী কথা বলে যে দুজনে কোন খবর কভার করতে গেলে তার প্রায়ই মনে হয় এই কথার পিঠে কথা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, বা এই অসাড় ধারা বিবরণ, বড় অপ্রয়োজন। অগ্নির ক্যামেরাই সব নিখুঁতভাবে তুলে নিতে পারে। সন্ধ্যে সাতটা, রাত্রি নটা, এগারোটা ইত্যাদি ধাপে ধাপে, ছড়িয়ে দিতে পারে অত্যাধুনিক, আধুনিক, ছাপোষা, নগণ্য, অগণ্য, বসার ঘরে, চা দোকানে, বাজারে আর আরো জানা অজানা তাজা খবর গ্রাহী শহরের কোণায় কোণায়।

অমল তবু মাটি কামড়ে পড়ে থাকে।

মায়ের কথা শুনে না।

বাবার কথা শুনে না

মল্লিকারও না।

একবার ভেবেছিল নিজস্ব খবরের চ্যানেল খুলবে। কিন্তু বাস্তবে দেখল এটা এখন আদৌ সম্ভব নয়।

তাকে তাই অপেক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞতা তার চাই। অভিজ্ঞ তাকে হতে হবে। বিচ্ছেদ, যতি, মাত্রাহীন, আধুনিক ধারা ভাষ্যকার তাকে হতে হবে।

প্রতিটি পরিস্থিতি, যা দেখতে শুনতে বসার ঘর, চা দোকান, পাড়ার জটলা আকুল, অথবা যা কেউ জানে না এসবই তাকে চেছে টেনে ঘেঁটে, মেখে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে। তাকে ক্লান্ত হলে হবে না। থেমে গেলেও হবে না।

এমন তীব্র জলোচ্ছ্বাস অমল আগে কখনও দেখেনি। বিশাল সর্পিল সুদীর্ঘ জলরাশি, করাল জলোচ্ছ্বাস হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জনহীন জনভূমিতে। এতোদঞ্চলে যাদের বসতি ছিল তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে

নিরাপদ আশ্রয়ে। তার চ্যানেলের বিরজু, নিখিল আর জীবেশ গেছে ত্রাণ শিবিরে। ওখানটা ওরা কাভার করবে।

অমল আর অগ্নি জনমানবহীন রূপসী ডাঙায় দাঁড়ানো। এক দুই জন সাহসী অত্যুৎসাহী মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। আকাশ গাঢ় কালো ছাপ ছাপ মেঘে ঢাকা। বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদের আলো মেঘ ভেঙে চুঁইয়ে আসছে। মেঘ এসে আবার ঢেকে নিচ্ছে আলো। উত্তাল জল আর উদ্দাম হওয়া। রূপসী নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বাঁধ ভাঙা নদী এখন খরস্রোতা। সাথে মুষলধারায় তীব্র বৃষ্টি। এরই মধ্যে একটু নিরাপদ অবস্থানে দাঁড়িয়ে অমলের লাইভ ধারা বিবরণী চলছে। ক্যামেরায় অগ্নি।

এখন এখানে ইন্টারভিউ দেবার কেউ নেই। অগ্নির ক্যামেরা জীবিত। অবিরাম আঁছড়ে পড়া জল বাষ্প বাতাস স্রোত অনিশ্চয়তা সব কিছু সে তার আলোকসংবেদী পর্দায় তুলে নিচ্ছে। এই উন্মাদ ঝড়ের ধারাভাষ্যে ক্যামেরা ম্যান অগ্নির সাথে অমল। অমলের ডর ভয় নেই, আতঙ্ক নেই। অমোঘ এই নেশা, অমোঘ এর অনিশ্চয় আহ্বান।

অগ্নির ক্যামেরা ছড়িয়ে আছে, ছুঁয়ে আছে এখন হাজার নিরাপদ, অনিরাপদ অনিশ্চয়, অত্যাধুনিক, আধুনিক সাধারণ অতি সাধারণ সব ড্রয়িং রুম, চা দোকান আর তাজা খবর অনুরাগীদের।

হঠাৎ পেছন থেকে অমলদের নিরাপদ দূরত্বের হিসাবকে ভুল প্রমাণ করে, এক বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে।

নিমেষে অমলের পা শূন্যে তোলে স্রোতের মাথায় লুফে নেয় তাকে। ফিকে এক সুর ভেসে আসে মহাশূন্যে, পিছু ডাকে, অমল চলে আয় বাবা।

ক্যামেরা ছাড়তে ভুলে গেছে যন্ত্রবৎ অগ্নি। 3600 সেকেন্ড চ্যানেলের ক্যামেরা ম্যান অগ্নি।

রুদ্ধশ্বাস দর্শক শ্রোতারা দেখছেন 3600 সেকেন্ড চ্যানেল এর রিপোর্টার অমল বসু ডুবছে, ভেসে যাচ্ছে।

ক্যামেরা চলছে, দর্শক শ্রোতারা বুঝতে পারছেন না একি প্রাণ সংশয় তুল্য বিপদ নাকি নিছক চ্যানেলের ধুলো ছোড়া চটুল অভিনয়।

কয়েক সেকেন্ড রুদ্ধশ্বাস বসার ঘর, পাড়ার ক্লাব, চায়ের দোকান। সমূল উৎপাটিত সুন্দরী গাছ মরে ভেসে যাওয়ার আগে আরেকজনকে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়। নিমেষে ভেসে যাওয়া অমলকে আছড়ে ফেলে নিরাপদ মাটিতে। অগ্নির ক্যামেরা থামে নি। তুলে নিয়েছে সব লাইভ।

অমলকে স্টুডিওর গাড়িতে তোলা হয়েছে। অগ্নির ক্যামেরা এখন ঘুমে। গাড়ি ছুটছে। সরকারী হাসপাতালের ইমার্জেন্সি। গাড়িতে বসা সুমেধা আর বিপ্লব অবিরত ফোনে, চ্যানেল, হাসপাতালে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। বসার ঘর, পাড়ার ক্লাব, চায়ের দোকান দুই ভাগ হয়ে পড়েছে। কি ডেডিকেটেড ওদের রিপোর্টার! ফটোগ্রাফারটা কি নিষ্ঠুর! কি সাহসী! কি বোকা! ইত্যাদি আরো কত।

সুমেধা রুমালে মুখ মুছে। কারো মুখে কথা নেই। অমলকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে.

জল খায় অগ্নি। অনেক কথা হবে। কথা হবে অনেক। উত্তর দিতে হবে হাজারো প্রশ্নের।

তবু অগ্নি কিছুটা নিশ্চিত। তার ক্যামেরা কথা বলে। তার জীবন্ত ক্যামেরা অন্তত তাদের অভিজ্ঞতা আর ডেডিকেশন নিয়ে কাউকে কোন প্রশ্ন করতে দেবে না।।

The Refugee Rehabilitation Movement in Tripura

Dr. Nityananda Das
Associate Professor, GDC, Khumulwng

The refugee rehabilitation movement was another important movement which ran side by side with other movements in Tripura. The refugee movement in Tripura started practically in 1950. It reached its climax in 1955-56 and keeping a low key for some times, it again gained a momentum in May – June 1960 and thereafter it merged into the greater democratic movement of Tripura.

The partition of India took place in 1947. The years immediately before and after the partition witnessed bloody communal riots in the territories which constituted Pakistan-East and West, as a result of which a large number of minority community were forced to leave their ancestral homes. In a very miserable condition, the affected people began to cross the borders and came over to India for a safe shelter. The flow of the evacuees in no time turned into waves and a part of these swept the forests and hills of Tripura state also.

By 'refuges', here, it meant those of the displaced persons who had come over to Tripura from East Pakistan after the Partition and who were specially dependent on government for relief and rehabilitation.

The then Ruler Of Tripura formed an official Relief Committee. Rona Budhjung who was then Secretary of the Newzealand Baptist-Mission and Tamizuddin, a Minister of Tripura state, were in the committee. But there was a report of much corruption in the relief work of the committee. Therefore, as an alternative measure, the 'Tripura Rajya praja mandal Relief Committee' was formed. Its president was Kumar Ramendar Kishore Deb Burman and Secretary and Cashier were Amarendra Deb Burman and Bhupendra Nath Bhaumik respectively. There were other forty members in the committee including Hemanat Kumar Debarma, Kamal Prava Devi, Biren Datta, Prabhat Chandra Roy, Prafulla Rakshit, Hrishikesh Deb Barma, Kala Mia (Contractor). The Committee made an appeal through a printed leaflet, dated 2nd Kartik 1356 T.(corresponding to 20 October 1946) requesting the people extend their helping hands and donate, in cash or kind, to the relief fund.

But the migration of minority Hindus from East Pakistan was nor acceptable to the central leaders, especially Nehru who felt that the Hindu migrants from East Pakistan had only taken shelter in India out of fear of lives. It was a temporary phenomenon. They would ultimately returned homes because of close affinities of culture, language and tradition between the people of two Bengals. Hence, there arose no question of their rehabilitation in India. The decision. Of the Central Government was then confined only to 'relief or doles' so as to enable them to live on until they went back

to their homes. They were treated as displaced persons and not refugees.

Objective of the Study:-

The refugee movement was spearheaded for relief, rehabilitation and well-being of the uprooted refugee. It started with a spirit of 'live' and 'let live'. The objective of the movement was not to render rehabilitation by itself but to put pressure on the government for making arrangement for quick and proper rehabilitation of the refugees.

It was a striking feature that while the uprooted people were struggling for relief and rehabilitation and thus for survival, the tribal people of Tripura also became sympathetic to their cause the Tripura Rajya Mukti Parishad, the biggest organisation of the tribal people lunched movement in association with ihe Communist Party demanding proper rehabilitation of the refugee in Tripura. Of course, there were then some other organisations of small tribal groups which took an anti- refugee stand demanding outright deportation of the refugee from Tripura. But unlike them the Mukti Parishad was sympathetic to the refugee. It was evident from a number of refugee colonies which came up in the triabal areas in Tripura. It would not have been possible if the Mukti Parishad which was known for its able armed resistance struggle during the years 1948- 51 took an anti- refugee stand.

1. The Refugee movement had left a mark on education in Tripura. Not only rehabilitation, but also the education of the refugee children was a crying need. There were only 123 primary schools and 9 secondary schools up to the date of association of Tripura state to the Indian Union.

The pioneering schools of this rank were the Netaji Subhas Vidyaniketan established on the 3rd of March 1948 at Agartala. It was followed by Vidyaniketan (Srinath Vidyaniketan) at khowai established in the early part of 1948. Bhavan (25 September 1948). Prachya Bharati School (26 January 1951), Bardowali School, Bani Vidyapith. These schools were at Agartala. It may be noted that Bani Viyapith was initially established through private initiative for girl students of the refugee families. It was later taken over by the government.

At present there are 32 non- government schools in Tripura. Out of them 8 are high schools and 24 higher secondary schools. Almost all the schools came up during the years from 1947 to 1960

Besides schools, colleges, with the same end in view, were also established through private initiative. In Tripura there was only one college, namely Maharaja Bir Bikram College established in 1947 at Agartala by the Maharaja. It could not meet the increasing number of students. Therefore, Ram Krishna Mahavidyalaya

was founded by some education lovers who were also migrants.

The student and teacher's movement were organised with an objective to uplift the conditions of the schools and colleges. The Communist party in Tripura was behind the curtain of the movements. It was through these movements that the Communist party spread its influence over the students and the teachers and strengthened its students' and teachers fronts in Tripura.

2. The other effect of refugee of refugee settlement in Tripura was on its economy. About 80 percent of the refugee who came to Tripura belonged to producing class. They were good agricultural workers, artisans and craftsmen.

3. The refugee movement had its conspicuous effect on Tripura's politics also. The refugee movement was not a political. The migrants were from East Bengal (East Pakistan) which was a political hinterland of Bengal politics. Among the refugee there were supporters of both the Congress and Communist parties. The Congress in Tripura had then little political influence over the tribal people.

Methodology

The study represents both a narration and an analysis or various problems and issues with related THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMENT IN TRIPURA (1950 – 60). Every effort has been made to arrange all the data scientifically and present them in a systematic way. Whenever possible, all statements of fact and figures have been supported by authentic notes indicating their sources. Efforts have been made to deal with the subject from an impartial objectivity.

Review of Literature

The present study pertinent to Democratic Movement in Tripura particularly Role of THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMENT IN TRIPURA (1950-60) in the democratization of Tripura politics in since 1945. A few studys have been conducted on democratic Movement in Tripura specially in Tribal Movement. In the subsequent paragraphs and attempt to has been made to review the related publication on Democranc Movement in Tnpura. Varied from of related Literature i.e, books, Articles in Journals & othere related documents, Are being reviewed here for the study.

Dasarath Dev has done a pioneer work on the THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMEX I IN TRIPURA (1950-60) activities in Tripura in his book & titled ᶜMuku Larishader ItikathaL In the study he has out line the origin & Role of THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMENT IN TRIPURA (1950-60).

Saroj Chanda in his work entitled 'Communist party garar juger duiti aprakasita dalil'. Mention the role of THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMENT IN TRIPURA (1950-60) in the democratic process of Tripura.

Biren Datta in his work 'Amar Smritite Tripurar Communist o Ganatantrik andoloner patabhumi 1900-1952'. Explain the role of THE REFUGEE LIMITATION MOVEMLN'l IN TRIPURA (1950-60) m the Tribal politics specially in communist movement in Tripura.

Aghore Debbarma in his book 'Tripurar Communist party o ganatantrik Andoloner Prathamik Stor'. Have discussed the activities & role of THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMENT IN TRIPURA (1950-60) in the politics of Tripura.

Other then Deba Prasad Sengupta in his work 'Tripura gana andolan O Communist partir Itikatha; Jagatjouti Roy 'Bidroha Bibartan O Tripura. Explain in detail different face of Tribal movement in Tripura for Democratic cause.

Dr. Bijan Mohanta in his work 'Tripura in the Light of Socio-Political Movements Since 1945'. Explain elaborately the different aspect of THE REFUGEE REHABILITATION MOVEMENT IN TRIPURA (1950 – 60) Nripen Chakraborty in his Articles 'Swadhinata jodhara Tripurai ki dheklen'. Explain different democratic movement in Tripura.

This book is useful for academician & Administrator working in the area of State & North-East.

Analysis the Topics

After the partion of India when the refugee in thousands began to trek to Tripura, the burden of their relief and rehabilitation fell on the Tripura Administration. But it was not prepared to tackle the situation.

The refugees came and took shelter wherever they found vacant spaces- some in school or college buildings, some in verandha of shops and those who came a bit late under the trees.

Big chunks of evacuees came at times and felt the need to organise themselves for their survival After the horrified Noakhali riot of 1946, the evacuees came10 Agartala and formed the 'Bastutyagi Janakalyan Samity'. The 'Tripura Sabalambi Udbastu Sangha' was formed under the leadership of Fanindra Prasad Sur some time in 1949 at Udaipur. A unit of the 'East Bengal Relief committee', founded by Dr. Meghnath Saha in Calcutta, was opened at Agartala by some refugee leaders like Jogesh Chandra Chakrabarty and others. Some Communist leaders opened initially a unit of the Calcutta based refugee organisation, Purbabanga Sankhalaghu Kalyan Samity' at Agartala. Similarly, the Congress-minded refugee

leaders had their 'Congress Udbastu Sahijya Samity'. Caste and community based organisations like 'Tripura Rajya Nath Samity', 'Tripura Rudrapal Samity' also had come up for the refugee cause. Thus, up to 1950, the number of refugee organisations even at Agartala were 10 to 12.

Dr. Shyama Prasad Mookherjee came to Agartala on 22 June 1950. He visited different Refugee camps. While addressing mammoth rally of several thousands people at Agartala. Dr. Mookherjee asked the refugee leaders to come to a common platform and fight unitedly for the cause to the refugees. His advice, on the other hand, to the refugee was that they should not do anything that might affect the interest and incur displeasure of the tribal people in Tripura. The refugee people should live together with them sharing their weal and labour hard to build a prosperous Tripura.'

The Tripura Central Relief and Rehabilitation Association organised a refugee rally on 8 August 1950 at Agartala and at last a big public meeting was held. It was a largely attended meeting which adopted some resolutions incorporating the demands of the Association. These resolutions were:

l. Independence of India through partition of the Country is responsible for the sorry plight of the Hindus of East Bengal who, as a sequel to it, have lost their ancestral hearts and homes, prestige and pride, wealth and property. Crores of patriots and freedom lovers of East Bengal and West Punjab had to lay down everything at the altar of Pakistan to earn Independence for the rest of the country. Therefore, the Government of free India must have to take upon itself the entire responsibility for proper rehabilitation of each and every evacuee from East Bengal and West Punjab as earlier assured.....The Tripura Administration and the Government of India must take appropriate steps immediately for rehabilitation of the evacuees so that they may live in the same happiness and comfort as they were used to in their ancestral homes'.

2. No evacuee can be sent to any camp without making adequate arrangements for drinking water, medical, educational and communication facilities..... Doctors, Advocates, Teachers and OTHER persons of technical professions must be rendered rehabilitation within one mile of the town and with facilities of drinking water, medical-aid-centre, road communications etc'.

3. Cent per cent posts of the Relief Rehabilitation Department of the government must be filled up by persons from the refugee'.

4. The dole facility cannot - be withdrawn before rendering proper rehabilitation of the refugee.

5. It is below dignity and against the basic norms of human life to live on doles without doing any work. The helpless evacuees have no alternative but to accept doles only to live on. Therefore, sooner the refugees are rehabilitation, the better,[8]

The Tripura Central Relief and Rehabilitation Association started movements for the rehabilitation and other rights of the refugees. About 50 lakh refugees came from East Bengal to India from 25 July 1949 to the end of 1950. But they were denied voting right. Meanwhile, the date of the first General Election was deferred.Cosecuently; the question of their voting right was raised a fresh.

The 1950 it was learn that Dr. Shyama Prasad Mookherjee would raise the issue in the December- Session of Parliament. The Tripura Central Relief and Rehabilitation Association hailed the move and instructed its different units to organise mass rallies and build public opinion in favour of the issue. Mass rallies were held in different parts of Tripura and resolutions in support of the demand were adopted and sent to the prime Minister, Nehru, the Deputy prime Minister, patel and also to Dr.Shyama Prasad Mookherjee and Pandit Lakhmikanta Maitra on 10 December 1950.

The State-level Convention was held on 3 and 4 February 1951. It was resided over by Makhan lal Sen, Editor, 'Bharat' and a former member of the Anusilan Samity.

The venue of the State-level Refugee Convention was fixed at the Umakanta Academy play ground, Agartala. But the Administration of Tripura declared the holding of convention at the proposed venue illegal. Consequently, the venue was shifted to the 'Durbar ground' (now Agartala Children's park).

The Convention adopted 18 resolutions in all demanding among others the following [10].

1. To make Tripura a Part 'B' State and to introduce a responsible government in it.
2. To enfranchise the refugees coming after 25 July 1949, so as to enable them to cast their voles in the first General Election.
3. To complete the rehabilitation by April 1951.
4. To deal with the refugee problems on war footings.
5. To take remedial measures against all sorts of privation of the trival people in Tripura.
6. To treat equally all the refugee coming before and after 1950 without any discrimination.
7. To stop frequent changing of the Chief Commissioner of Tripura in the interest of quick rehabilitation of the refugee.

The Administration started to take some steps m the matter of settlements of the refugees. But it was done in some cases against the tribal interest in the state. The Sangjukta Bastuhara Parrshad demanded proper rehabilitation of the refugee without encroaching upon the tribal interest. It demanded that government khas land might be reclaimed for refugee rehabilitation.

During the period there were many instances of forcible occupation of jute land of the tribals by the refugee mahazans very often in connivance with the 'Administration'[14] The tribals in Tripura reacted sharply against the forcible and illegale gabbing of tribal lands.

The Tripura Rajya Mukti Parishad, a tribal organization known for its armed resistance struggle during the later forties was far from any communal passion. It believed that democratic movement in Tripura could nto succeed unless there was unity between the tribal and the non-tribal people. The Mukti Parishad, therefore, called upon its workers not to take all refugees for their enemies.

CONCLUSION

In a tiny state whose roughly two-third areas being hills and forest, there was a scarcity of cultivable land. Therefore, to ease pressure on land the government could have formulated a rehabilitation scheme based on industry.

But this was not done. As a result, scrambling for land continued. The refugee issues should have been tackled more cautiously and rationally keeping in mind the tribal sentiments and the sensitivity of the region as well.

In regard to the West Pakistan refugee the Central Government addressed itself to their problems with right earnestness. Roughly within two years they were resettled and integrated into the body politic of India. But the tragic migration of the East Pakistan refugee was not faced with due seriousness. The Government rehabilitation work did not betray meaningful attempt at tackling the refugee problems Consequently, the unresolved issues of the refugees in Tripura confront the society even today. Had the refugee rehabilitation programme been formulated more rationally and executed m a proper way and of course, with right earnestness, Tripura would remain free of blood stains of ethnic unrest as seen in recent times.

Bibliography

1. Janakalyan (Bengali Bi-weekly). 12 Asad 1357 B. S. (July 1950).
2. Ibid. 24 Sravana 1357 B. S. (August 1950). Trans.
3. Leaflet, dated 4th January 1951, signed by Nibaran Chandra Ghosh, President, Tripura Central Relief and Rehabilitation Association, and Convener, All Tripura Refugee Convention. Agartala. Published in Janakalyan, (Bengali Bi-weekly). 21 Pons 1357 B. S (January 1951), Agartala.
4. Janakalyan (Bengali Bi-weekly). 27 Magh 1357 B. S. (February 1951). Agartala.
5. Ibid. 27 Falgoon 1357 B. S.(February 1951).
6. Ibid. 27 November 1952.

7. Chancla, Saraj ed. 1983: 38. Tripura communist parti garar yuger duti aprakasita dalil. Agartala. (Beng).
8. Sen, Tnpur Chandra 1970: 8-9. Tripura in Transition. Agartala.
9. Deb, Dasarath 1992 : 21. Samantatantrik byabasthar birudhde Mukti. Parishader sangram (Beng), Agartala.
10. Ibid. P. 21.
11. Deb, Dasaratlia 1991. Tripura ganatantnk andolane Gana Mukti Parishader bhumika (Beng). Souvenir. Fitth Bienniel Conference, 1991. Tripura Employees' Coordination Committee. Agartala. P.3.
12. Sen, Tripura Chandra 1970. Op. Cit Pp. 74- 75.
13. Ghosh, Bhanu.l998.Udbastu punarbasan o Gana Mukti Parishad. Lama. Dasaratha Deb commemorative issue; published m the Golden Jubilee Year of Tripura Rajya Upajati Gana Mukti panshad (n.d.). Agartala. Pp.95-96.
14. *Tripura Katha* (Bengali weekly). 20 April 1955, Agailala. 15.*Ibid.* 19 January 1955.
16 *Jagaran* (Bengali Daily). 19 January 1956, Agartala.
17. Memorandum submitted by ATRA to the Union Minister for Rehabilitation. *Jagaran* ^Bengali Daily). 21 January 1956, Agartala. 18 *Jagaran* Bengali Daily). 6 November 1957, Agartala.
19. Proceedings of the Eighth Annual Conference of ATRA held on 31 January & 1 February 1959 *jagaran* (Bengali Daily). 3 February 1959.
20. *Samaj* (Bengali Weekly). 7 December 1957, Agartala.
21 Jagaran (Bengali Daily). 24 October 1959, Agartala.
22 *Ibid* 19 April 1960.
23. *Ibid.* 3 May 1960.
24 *Ibid* 4 May 1960.
25. *Ibid.* 10 May 1960.
26. *Ibid.* 17, 19, 20 May 1960.
21. *Ibid.* 22 May 1960.
28. *Ibid.* 24 May I960.
29. Menon, K.D., ed. 1975 :137. *Tripura District Gazetteers.* Government of. Tripura.
30. Chakrabarti, Prafulla K. 1990 : 38. The Marginal Men. Calcutta.
31. Press Release, Dated 22 October 1960, issued by the Union Ministry of Relief and Rehabilitation. In *Jagaran* (Bengali Daily). 27 October 1960, Agartala.

লোকনাট্যে লোকভাষা ঃ শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা'

ড. মৌসুমী পাল,
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
খুমলুঙ সরকারী মহাবিদ্যালয়, খুমলুঙ, ত্রিপুরা

শেখর দেবরায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৭ সালের ২৩শে জুন, আসাম রাজ্যের (বরাক) শিলচর শহরে। সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ছাত্র জীবন থেকেই। মূলত নাট্যচর্চা ও অভিনয়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত। ১৯৮৭ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'অন্তিমের সুর' প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালে দিল্লিস্থ 'সফ্‌দর হাসমি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' আয়োজিত 'পথনাটক' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কোলকাতা, আগরতলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় করেছেন। অভিনেতা, নাট্যকার ও পরিচালক হিসেব পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। শেখর দেবরায়ের নাটকের বিষয় প্রধানত সমকাল। তাঁর বিখ্যাত নাটক মনসাকথা'য় মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করলেও, চাঁদ-মনসার কাহিনীর অন্তরালে তিনি বর্তমানে মানুষের ভাব ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন।

নাট্যশিল্পের আদিরূপ নিহিত রয়েছে লোকনাট্যে। বলা যায় গ্রামীণ জনজীবন থেকেই লোকনাট্যের উদ্ভব। আঞ্চলিক মানবগোষ্ঠীর আদিম বীরব্যঞ্জক কাহিনী লোকনাট্যের মধ্যে স্থান লাভ করলেও কালান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সভ্য সমাজের ধর্ম ও সামাজিক আদর্শও লোকনাট্যের মধ্যে স্থান লাভ করলেও কালান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সভ্য সমাজের ধর্ম ও সামাজিক আদর্শও লোকনাট্যে স্থান পায়। অঞ্চল বিশেষের মানুষের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, আঞ্চলিক জীবনযাত্রার বহুল উপাদান লোকনাট্যের মধ্যে উপস্থাপিত হয়। নৃত্য, সঙ্গীত পরিবেশন ও অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে লোকশিল্পীরা লোকনাট্য উপস্থাপন করে থাকেন। এর সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্যের প্রয়োগ। লোকনাট্যের বিষয় হয়ে থাকে প্রধানত ধর্মমূলক, ঠাকুর দেবতার কাহিনী, দৈবশক্তি, পাপ পুণ্যের কথা, সুনীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি। এসবের মধ্য দিয়ে পুণ্যের কাজ, পাপের পরাজয় চিহ্নিত হয়ে থাকে।

শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' নাটকটি লোকনাট্যের বিশিষ্ট আঙ্গিকে রচিত। নাটকের কাহিনী অংশ প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্য থেকে নেওয়া। নাট্যকার এতে ধর্মভাবনার মোড়কটিকে সরিয়ে রেখে আধুনিক চিন্তাভাবনার বাহন হিসেবে নাট্য কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন। নাট্যদেহ নির্মাণে লোকনাট্যের বিশিষ্ট রূপকে গ্রহণ করেছেন। গায়েন ও দোহারের সমবেত বন্দনার মধ্য দিয়ে নাট্যবৃত্ত শুরু হয়েছে। বিষহরি বা মনসাকে আহ্বান করা হয়েছে। এরপরে গায়েন নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত করেছে। গায়েন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মতো কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। নাট্যকার শেখর দেবরায় 'মনসামঙ্গল' কাব্য থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করেছেন। গায়েন ও দোহারের সমবেত কণ্ঠের গীতে নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি ঘটেছে। শুধু তাই নয় প্রয়োজন মত গায়েন ও দোহারগণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যই হল গায়েন, দোহার এমনকি দর্শক কখনো কখনো নাটকের চরিত্র হয়ে যেতে পারে।

'মনসাকথা' নাটকে মঞ্চসজ্জা বা অভিনয়ের জন্য বেশভুষা বা অভিনয়ের নির্দেশনা নাট্যকার দেননি, এমনকি স্থান-নামও উল্লেখ করেননি। বস্তুত লোকনাট্যের ক্ষেত্রে এসবের প্রয়োজন থাকে না। নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে স্থান-কাল বুঝে নিতে হয়। নাট্যকার একক অভিনয়ের মাধ্যমে বার বার রূপ বদল করেন। কখনো তিনি কথক ঠাকুরের মতো হয়ে ওঠেন। আবার কখনো তিনি চাঁদ সদাগর, কখনো বেহুলা, কখনো মাঝিমাল্লা, কখনো সনকা, কখনো বা মনসা হয়ে যান। নাট্যকার তথা অভিনেতার গলায় ঝুলে থাকা ওড়নাটি হয়ে ওঠে

কখনো চাঁদের হাতের হেম তাল, কখনো মনসার হাতের সাপ আবার কখনো অত্যাচারিতের দড়ির ফাঁস, আবার কখনো সনকার বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকা মনসার ঘট। নাট্যকার অনেকগুলি বিষয়কে একই দেহে সন্নিহিত করে প্রচলিত মনসার আখ্যানকে লোকনাট্যের আধারে পুণর্নির্মাণ করেন।

'মনসামঙ্গল' কাব্য বাংলা ও আসামের লোক জীবনের জন্ম ও বিবর্তন ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইসব অঞ্চলে সর্পপূজার কেন্দ্রে আছেন নারীরূপা সর্প দেবতা জাঙ্গালী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি। এই মনসার কাহিনী নিয়েই নাট্যকার শেখর দেবরায় লোকনাট্যের আদলে 'মনসাকথা' নাটকটি রচনা করেছেন। উপস্থাপনায়, রীতিতে, চরিত্র নির্মাণে নাটকটি সার্থক লোকনাট্য হয়ে উঠেছে। নাট্যকার এখানে অভিনয়ের জন্য নিজস্ব লিখিত রূপ নির্মাণ করেছেন। 'মনসাকথা' সমাজ ইতিহাসকে বহন করেছে। আমাদের এই অঞ্চলে প্রচলিত ও জনপ্রিয় 'ওঝার গান' এর ধরনের নাটকে গায়েন, বায়েন ও দোহার মিলে মনসাকথা গান করেছে।

এই জাতীয় নাটকের ভাষা লোকভাষার পরিচয়ে মণ্ডিত হয়। লোকভাষা বলতে সাধারণভাবে বোঝায় গেঁয়ো ভাষা, অর্থাৎ যে ভাষা নাগরিক, মার্জিত বা ষ্ট্যান্ডার্ড নয়। ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলিই লোকভাষার নির্ণয়ক। অবশ্য এই গ্রামীণ কথাটির মধ্যে কোনো নিন্দা বা অবজ্ঞার প্রশ্ন নেই, এটি নেহাৎই একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ধারণা, যা নাগরিক বা শহুরে নয়, তা-ই লোকভাষা। কিন্তু সুকুমার যেন লোকভাষাকে গ্রাম্য, শহুরে, কেন্দ্র ও প্রাপ্ত বা অধোবর্গীয়জনের ভাষা এই সব পরিভাষা দিতে চাননি, তিনি এই ভাষাকে লোকসাহিত্যের ভাষা বলেই অভিহিত করেছেন।

নাট্যকার শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' নাটকেও আমরা এই লোকভাষার পরিচয় পাই। এই নাটকটির ভাষা সম্পর্কে সমালোচক অমিতাভ দেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন—"শেখরকে আমার অভিনন্দন। তিনি বরাক উপত্যকার বহমান এক লোকভাষাকে, পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, অন্য এক ভাষারূপ দিতে পেরেছেন।" (শেখর দেবরায়-মনসাকথা, পৃঃ ৪৩)। 'মনসামঙ্গল' কাব্য বাংলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। মূলত নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যেই কাব্যটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই সাধারণ মানুষদের জন্যই সাধারণ মানুষদের মুখের ভাষা অর্থাৎ লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। শেখর দেবরায়ও তাঁর 'মনসাকথা'র নাট্য সংলাপে এই লোকভাষা ব্যবহার করেছেন।

অঞ্চল বিশেষের লোক ভাষার সঙ্গে শিল্পীর কল্পনাশক্তি প্রেরণার মতো কাজ করেছে। নিজের শক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই অঞ্চল বিশেষে লোকভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি সৃজন করলেন নাটকের বিষয় উপযোগী ভাষা। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত ভাষা আমাদের প্রচলিত লোক পরিবেশের ভাষাকে অলঙ্কৃত করেছে। এই নাটকের একটি অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগর সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, সমাজপতি, স্বৈরতান্ত্রিক পুঁজিপতি। চাঁদ নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। তাই সে ঘোষণা করে—"আমার রাজ্যের সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা-আচ্চা করা নিষেধ। এই কথার খেলাপ কেডা করে একবার দেখতি চাই! বলি, —সব্বাই চুপ করি আছ ক্যান?" (ঐ, পৃঃ ১১)।

কিন্তু ঘরে তার স্ত্রী সনকা মনসার পূজা করতে চায়। চাঁদের সপ্তডিঙার মাঝিমাল্লারও মনসার ভক্ত। তা জানতে পেরে চাঁদ বলে—"হেই! শুইন্যা রাখ! আমি চান্দ! কোটিশ্বরের বেটা— চন্দ্রধর! চম্পাইয়ের সমাজপতি! সব্বাইরে শেষবারের মত মানা করতেছি, —চম্পকের সীমানায় কেউ যদি চেঙ্গমুড়িকানীর পূজা করে তে অইলে দণ্ড পাতি অবে।" (ঐ, পৃঃ ১৮)। ছয়পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত সনকা স্বামীকে বুঝানোর চেষ্টা করে মনসার সঙ্গের বিবাদ না করার জন্য। কিন্তু অহংকারী চাঁদ বুঝতে চায় না। বরং উদ্ধত কণ্ঠে বলে—"কিচ্ছু যায় নাই! কানীর উচ্ছিষ্ট ছয় পুত্তুররে গাঙ্গুড়্যা নদীতে ভাসাইয়া দিছি। ছলনা ছাড়া কানীর আর কি বল আছে? চাতুরী কইর‍্যা আমার শঙ্খই ওঝারে বিষ দিছে! তবু আমি ডরাই নাই। কিন্তু চম্পকে ঢেমনা ভাতারী চেঙ্গমুড়িকানীর পূজা করতে কারুকে দিমু না—" (ঐ, পৃঃ ২৬)।

মনসার সঙ্গে চাঁদের কথোপকথনে চাঁদের অনমনীয় ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। সে মনসাকে জানায়—"আইজও চান্দ সদাগর যে কথা কয়, চম্পকের মনিষ্যির কাছে সেটাই শেষ কথা! আর শোন! পুরুষ অইয়ে লঘু জাতি নারীরে পূজা দিমু, জান থাকতি তা হবে না।" (ঐ, পৃঃ ২৪)। মনসাকে পূজা দেওয়ার কথা চাঁদ ভাবতেই পারে না। চাঁদ মনসাকে গালিগালাজ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। বলে—"চম্পকের সীমানা ছাইড়্যা এক্ষুণি চইল্যা যা! চেঙ্গমুড়িকারী!" (ঐ, পৃঃ ২৩)। চাঁদ সদাগর চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার একাধারে সমাজপতি সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উদ্ধৃত নাটকে নাট্যকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রচলিত সমাজের লোকভাষা। এই নাটকে শুধু চাঁদ সদাগর নয়, প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপে এই লোকভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নাটকের আরেকটি চরিত্র বেহুলা, চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের বধূ। বাসরঘরে লখীন্দরের মৃত্যু হলে কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্রকে চাঁদ গাঙুরের জলে ফেলে দিতে বললে বেহুলা প্রতিবাদ করে—"একি আচরিত লীলা! অউক না এক রাত্তির, তবু লখাই তো তারই সোয়ামী। শ্বশুর মান্যজন ঠিকই। কিন্তু তার অন্যায্যি কথা তো মানি লওন যায় না!" (ঐ, পৃঃ ৩০)। চাঁদ সদাগরের রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে লখাই এর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বেহুলা। বলে "দেইখ্য, আমার সোয়ামীরে আমি জিয়াইয়া আনুম।" (ঐ, পৃঃ ৩১)। বেহুলা সমস্ত দেবতার প্রীতিসাধন করেছে দেবলোকে গিয়ে। কারণ সে জানে মনসা যেহেতু শিবকন্যা ও দেবী তাই অন্যান্য দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে মনসাও তুষ্ট হতে বাধ্য। তাই মনসাকে উদ্দেশ্য করে বেহুলা বলে— "মাগো! একবার আমার পানে চাও! সন্তান মনে কইর‍্যা দয়া কর মা! আমার সোয়ামীর পরাণ ফিরাইয়্যা দ্যাও। যে পণ কইর‍্যা শ্বশুরের বাক্যি না শুইন্যা তুমার কাছে আইছি সেই পিতিজ্ঞা পূন্ন করতে তুমি আমার সহায় হও!" বেহুলা মনসার মতই উপলব্ধি করে মনসাকে উপেক্ষা আসলে চাঁদ সদাগরের 'মাইয়্যা মাইনষেরে' উপেক্ষা করা। বেহুলার ভাষায় - 'নারীর যন্ত্রনা আরেক নারী ছাড়া কেই-বা বুঝব!' (ঐ. পৃঃ ৩৪)। তাই এক নারীর কাছে আরেক নারী এসেছে তার দুঃখের 'পিতিকার' এর জন্য। বলে— "চম্পকের সমাজর সনে এই লড়াইয়ে আমি যদি তুমার লগে থাকি, তে অইলে তুমি আমারে নিজগুণে বিশ্বাস করবা?" (ঐ, পৃঃ ৩৪)। বুদ্ধিমতী বেহুলা মনসার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাতে চায়। বলে- "যদি সদাগরই না থাকে তে অইলে তুমার বিজয় কথা লেখা অইব কি কইর‍্যা" (ঐ-পঃ ৩৮)

বেহুলা মনসাকে কথা দেয়—"তুমি আমার সোয়ামীরের ভাল কইর‍্যা দ্যাও—তে অইলে আমরা সোয়ামী স্ত্রী মিল্যা তুমার মহিমা প্রচার কর‍্যে নাগমাতার মাইন্যতা আদায় করব।" (ঐ, পৃঃ ৩৫)। মনসাকে তুষ্ট করে বেহুলা স্বামী লখীন্দরকে জীবিত করে, ছয় ভাসুর ও চৌদ্দডিঙা নিয়ে ফিরে আসে চম্পক নগরে। সবাই বেহুলার জয়জয়কার করলে বেহুলা বলে— "একি করতিছ তুমরা! কার জয় দিতিছ! আমি তো নিমিত্ত মাত্র। শোন গো চম্পাইবাসী! জয় যদি দিতিই হয় অইলে আমার লগে কণ্ঠ মিলায়ে পরথমে বল— জয় নাগমাতা! জয় বিষহরি! জয় আস্তীকজননী! জয় অমৃতনয়নী! জয় মা মনসার জয়!" (ঐ, পৃঃ ৩৭)।

বিপাকে পড়ে চাঁদ সদাগর বাম হাতে পেছনে ফিরে মনসাকে ফুল ছুঁড়ে দেয়। তা দেখে বেহুলা বলে— "এই কি অইল গো মা! বাম হাতে পূজা তো অমান্যির পূজা!" (ঐ, পৃঃ ৩৯)। বেহুলা কোন অসহায় নারী নয়, বৈধব্যের যন্ত্রণাকে সে মেনে নিতে পারেনি। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তাঁকে স্বতন্ত্র গৌরব দান করেছে। শেখর দেবরায় তাঁর 'মনসাকথা' নাটকের বেহুলা চরিত্রটিকে সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং বেহুলার কণ্ঠে যে কথাগুলি নাটকে শোনা যায় সেই সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছেন।

নাটকে সনকা বণিক সমাজপতি চাঁদ সদাগরের স্ত্রী, চম্পকনগরের রাণী, চাঁদ সদাগরের সাতপুত্রের মা এবং মাঝিমাল্লাদের বিশ্বাসের পাত্রী। সনকা যেমন মাতা, তেমনি পত্নী। প্রতিটি পদক্ষেপে তার উভয় সংকট। সনকা স্বামীপুত্রের মঙ্গলের জন্য, চম্পকনগরীর মঙ্গলার্থে পূজা দিতে চায় মনসার। তাই সে বলে—"পূজা দিমু

আমার সোয়ামীর তরে—ধনে-জনে ঘর সংসার উথলাইয়া উঠব। আমাগো সাধের চম্পাইয়ের মানুষজন সুখে থাকব। এই জন্যি বারা এনেছি। মা মনসার বারা!" (ঐ, পৃঃ ১৫)। সনকা মনসা পূজা করবে জানতে পেরে শিবভক্ত চাঁদ হেতালের লাঠি মাথায় উপর তুলে ধরে।

সনকা তখন বুঝতে পারে কি ঘটনা এখন সদাগর ঘটাবে। তাই সে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে এবং আর্তস্বরে বলে—"আমি তুমার জনম মরণের সাথী, তুমার পরাণের ধন—তুমার সন্তানের জননী! আমার কথাটা রাখ! মা মনসারে পূজা করার অনুমতি দাও—।" (ঐ, পৃঃ ১৫)। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সনকা খুব সাধারণ নারী, বাঙালী গৃহবধূ ও স্নেহময়ী জননী। তবে এই সনকাই পরে অসাধারণ হয়ে উঠেছে তার সংলাপের মাধ্যমে। চাঁদ মনসার বারি ভেঙ্গে দিলে সে হাহাকার করেছে। কিন্তু স্বামীপুত্রের মঙ্গল কামনা করেছে।

সনকা মাঝিমাল্লাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী। তারাও সনকাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। তারা চাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইলে সনকা চাঁদকে বুঝাবে বলে কথা দেয় এবং তাদেরকে বলে "তবে তোরাও একটা কথাও দে বণিক্যের ডিঙ্গা ছাইড়্যা অন্য কোথাও যাবি না!" (ঐ, পৃঃ ১৭)। সনকা চাঁদকে বুঝানোর চেষ্টা করে— "ওগো সোয়ামী, এইবার ক্ষান্তি হও—মা বিষহরিরে আর রাগাইও না, দেখলা তো তুমার জেদে মোর ছয় ছয়টা পুত্তুরের পরাণ গেল। হায় গো সোয়ামী! জন গেছে— এইবার ধনও যাইব!" (ঐ, পৃঃ ২৫)

ছয় পুত্রের মৃত্যু ও শেষে লখীন্দরের মৃত্যু হলে সনকা হাহাকার করে এবং ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। লখীন্দরের মৃত্যুতে আর্তনাদ করে সনকা—"ওগো সোয়ামী! এইটা তুমি করল্যা? সমাজপতির মান রাখতি গিয়া আমার ছোট পুলাটারেও নাশ করলা।" (ঐ, পৃঃ ৩০)। বেহুলা যখন মৃত স্বামীকে নিয়ে যেতে চেয়েছে ভাগ্যের অন্বেষণে, তখন সনকা চাঁদ সদাগরকে অনুরোধ করেছে পুত্রবধূকে যাবার অনুমতি দিতে—"ওগো সোয়ামী—বেহুলারে ভাসানে যাইতে দেও। আমার কথা তো কোনদিনই গ্রাহ্যি করলা না! এই মাইয়্যাটা যদি কিছু করবার চায় তারে বাধা দিও না, নিজের সোয়ামীরে লইয়া সে যাতি চাইতেছে—ওগো সমাজপতি! তারে যাবার অনুমতি দ্যাও!" (ঐ, পৃঃ ৩১)

সনকা এবং চম্পকনগরীর অধিবাসীরা বেহুলার জয়গান করলেও চাঁদ মনসার সঙ্গে বেহুলার শর্তের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সনকা বেহুলা কিছু বলার আগেই বলে ওঠে— "সদাগর! এখনো বুঝলা না তুমি! সেই পুরান জিদ ধইর‍্যা বইস্যা আছ! হাতের ছোঁয়ার মধ্যেই হারাইয়া যাওয়া পোলার বইস্যা আছে। তাদের বুকে আঁকড়াইয়া ধরার জন্যি আমার পরাণটা আকুলি বিকুলি করতেছে। তুমি! তুমি সমাজপতি অইয়ে বুকে পাথর বাইন্ধবার পার— কিন্তু আমি যে মা! আমি যে পোলাপানগোর মুখ চাইয়্যা আর পারি না!" (ঐ, পৃঃ ৩৮)। এখানেই নাট্যকার সাবলীলভাবে ভাষা প্রয়োগ করে সনকাকে সাধারণ নারী থেকে একজন প্রতিবাদিনী নারীতে পরিণত করেছেন।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র মনসা। সর্পদেবতা মনসার পুজো সমগ্র বাংলাদেশে ও আসামে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। 'মনসামঙ্গল-এ মনসার পূজো প্রচারের কাহিনী প্রধান। পূজো প্রচার করতে গিয়ে মনসা খল চরিত্র হয়ে ওঠে। শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা'য় মনসা নির্যাতিতা নারীর দেবতা। নাট্যকার মনসা চরিত্রে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার থেকে বুঝা যায় মনসা খল বা প্রতিহিংসা পরায়ণ নন। বরঞ্চ সে মৃদুভাষিনী, যুক্তিবাদী। চাঁদ সদাগরের দ্বারা উৎপীড়িত মাঝিমাল্লারা যখন মনসাকে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করছে, তখন সে স্থিরবুদ্ধিতে বলেছে—"চম্পকের সদাগর অইল শিবভক্ত। আর আমি শিব কইন্যা। মাইনষের মনটাই অইল আসল কথা— মনে যদি কেউ বিবাদের বীজ পুইষ্যা রাখে তে অইলে কি সুবিরিক্ষিত জন্ম হয়? আমার মনর লয়, চান্দ বণিক্য এই কথাটা জানে না! তাই ভেবেছি আমি তারে ঝুমামু, বিবাদটা ঠিক পথ না!" (ঐ, পৃঃ ২০)।

মনসা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুগতদের বোঝায় চাঁদ চম্পকের মান্যজন, তার ধন

ও জন দুই-ই আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও যে বল আছে এই কথাটা বোঝানো দরকার চাঁদকে। চাঁদ মনসাকে চেঙমুড়িকানী বলে গালি দিলে মনসা শান্তভাবে বলে— "চান্দ! তুই আমরে নিত্যদিন গালি দিস্। কিন্তু এখন আমার কথা শোন,—ক্যান এইয়েছি আমি তোর কাছে! আমার নাগ পোলাপানেরা— তোর মাঝিমাল্লারা আমার পূজার্চনা করতে চায়,—তুই বাধা দিস্ না চান্দ।" (ঐ, পৃঃ ২৩)। চাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে মনসার ভাষায় ধীর স্থির ভাব ফুটে উঠে। মনসা চাঁদকে অনেকভাবে বুঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু চাঁদ তার নিজের জায়গায় স্থির থাকে। তাই মনসা চাঁদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু চাঁদকে হত্যা করতে চায়নি। কারণ সে জানে— "লড়াই করতি গেলে মাথা শেতল রাখতি হয়। কৌশল করি চলতি হয়।" (ঐ, পৃঃ ২৮)।

বেহুলা লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে মনসার দরবারে উপনীত হলে মনসা বলে—"চিনতে পারছি বটে—তুই চম্পাইয়ের সদাগরের ছোট বউ! বিয়ার রাইতে ছিলা লোহার বাসরে। কি গো নেতা বইন! চন্দের দম্ভ কোথায় গেল? আইজ দেখি তার ছাওয়ালের জীবন ভিক্ষা চাইতে মোর ঠায়ে এয়েছে তারই পুতের বউ—" (ঐ, পৃঃ ৩৩)। মনসা বুদ্ধিমতী নারী। চাঁদ সদাগরের কাছে শক্তিতে সে হেরে যাবে হলে কৌশলে যুদ্ধ জয় করেছে। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার এই গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে মনসা হয়ে ওঠে গণসংগ্রামের নায়িকা। কিছুতেই পরিস্থিতি নিজের মুঠোর বাইরে যেতে দেয় নি মনসা। নাটকে মনসা যে লোকভাষায় কথা বলেছে তারজন্য তিনি সর্প দেবতা দেবী মনসা হলেও সাধারণ মানুষের অনেক কাছে আসতে পেরেছে। এবং এই লোকভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষ নিজেকে একাত্ম করে নিতে পেরেছে।

এই লোনাট্যে ব্যবহৃত লোকভাষায় আমাদের একান্ত আপন রাঙামাটির ধূলায় ধূসরিত মানুষের মৌখিক ভাষার লালিত্য খুঁজে পাই বলেই এতো আনন্দ হয়। বিশেষ করে 'গায়েন' চরিত্রে কথক ও লেখকের সুর এক হয়ে মিশে গেছে, যিনি পুরো নাটকের সূত্রধার রূপে কাহিনী বর্ণনা করে যান। চাঁদ সদাগর যখন বুঝতে পারে ঘটনা বাঁক ফেরার মতো মোড় নিচ্ছে তখন গায়েনের গলায়ও ঘটে পরিবর্তন—"দরিয়ায় ভাসনের রীতিনীতি সদাগর ভালই জানে। উথাল পাথাল দরিয়ার ঢেউয়ের উল্টা চললেই বিপদ! ডিঙ্গা ডুবতি পারে। কিন্তু কাঁড়ার এক্কেবারেই ছাড়ি দেওয়া কি ঠিক অইব? একবার অন্তত কূলে ভিড়ানোর চেষ্টা করতে দোষ কি?" (ঐ, পৃঃ ৩৭)।

দরিয়ার উপমায় জীবনের স্রোত-প্রতিস্রোতের দ্বৈততা সুন্দরভাবে স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার। 'মনসাকথা' যেহেতু একটি লোকনাট্য, তাই এই লোকনাট্যে সাধারণত গায়েন, বায়েন এবং দোহার মুখ্য ভূমিকা নেয়। আর সেজন্যই আলোচ্য নাটকে এই চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে বায়েনের তীব্র তালবাদ্যে আর গায়নের মনসা জয়গানের মধ্য দিয়ে। নাটকটির সংলাপ রচনায় নাট্যকার লোকভাষাকে আশ্রয় করেও তার সর্বজন বোধ্য রূপ নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সব মিলিয়ে একথা বলা যায়, শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক অভিনব সার্থক শিল্প সংযোজন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) শেখর দেবরায়-'মনসাকথা', নবচন্দনা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০২, কলি-০৯।

২) ডঃ হীরেন্দ্র কুমার শূর— 'আসাম ও ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত', পারুল প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০০, কলি-০৯

৩) সঞ্জীব দেবলস্কর— 'বরাক উপত্যাকার ইতিহাস ও সমাজ', পৌণমী প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৪) অশোকানন্দ রায়বর্ধন— 'ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির উৎস সন্ধান ও বিষয়বিন্যাস', স্রোত প্রকাশনা, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৩, কুমারঘাট-৬৪।

৫) অশ্রুকুমার শিকদার— 'বাংলা ভাষা ঃ কিছু ভাবনা', উর্বী প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৯, কলি-০৪।